Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতা ও সন্তান উভয়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হালিমাতুজ জাবিয়া

রোলঃ 23100120070

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতা ও সন্তান উভয়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হালিমাতুজ জাবিয়া

রোলঃ 23100120070

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা মাতা ও সন্তান উভয়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হালিমাতুজ জাবিয়া, আইডিঃ 23100120070 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতা ও সন্তান উভয়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

হালিমাতুজ জাবিয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

হালিমাতুজ জাবিয়া

আইডিঃ 23100120070

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা 5

ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব ও ধারণা 7

পিতা মাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা 9

পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ 12

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য 16

পিতা-মাতার আনুগত্যের চূড়ান্ত রূপ 25

পিতা মাতার হক্ব ও অধিকার 27

পিতা–মাতার সাথে অবাধ্যতার পরিণতি 34

পিতা মাতার ইন্তেকালের পর করণীয় 49

অমুসলিম মাতা-পিতার সাথে আচরণ 55

সুসন্তানের জন্য প্রস্তুতি 60

সন্তান জন্মের পর করণীয় 68

সন্তানের গুরুত্ব মর্যাদা ও ফজিলত 74

আকিকা ও খৎনা সম্পর্কীয় অধিকার 76

সন্তানের হক্ব ও অধিকার 80

সন্তান প্রতিপালনের নিয়ম 113

শাস্তি দেওয়ার উত্তম ও অনুত্তম পদ্ধতি 119

সন্তানের এসলাহ ও তরবিয়ত 123

সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার সংরক্ষণ 127

সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার 129

উপসংহার 137

ভুমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে। মানবসমাজের মৌলিক একক হলো পরিবার, আর এই পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন পিতা-মাতা ও সন্তান। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র রক্তের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি দায়িত্ব, কর্তব্য, ভালোবাসা, সম্মান ও নৈতিকতার এক পবিত্র বন্ধন। ইসলামে এই সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উভয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য, যা একটি সুশৃঙ্খল, নৈতিক ও কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার মর্যাদা ও তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্বকে অত্যন্ত উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা আল-ইসরা: ২৩)

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তাওহীদের পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যা ইসলামে তাদের মর্যাদা কতটা উচ্চ তা স্পষ্ট করে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" (সূরা আল-আনকাবুত: ৮)

এছাড়াও কুরআনে সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রতি বিনয়, নম্রতা ও দয়ার আচরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

"তুমি তাদের প্রতি দয়ার সাথে বিনয়াবনত হও এবং বল, 'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।'" (সূরা আল-ইসরা: ২৪)

অপরদিকে, ইসলাম শুধু সন্তানের উপর দায়িত্ব আরোপ করেই থেমে থাকেনি; বরং পিতা-মাতার উপরও সন্তানের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সন্তানের সঠিক লালন-পালন, নৈতিক শিক্ষা, দ্বীনী জ্ঞান প্রদান এবং তাদের আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।" (সূরা আত-তাহরীম: ৬)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, পরিবারকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করা এবং তাদেরকে পাপ থেকে দূরে রাখা পিতা-মাতার দায়িত্ব। হাদীসেও এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও পারস্পরিক দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে এক পক্ষের উপর শুধুমাত্র কর্তব্য আরোপ করা হয়নি; বরং উভয়ের জন্যই নির্ধারিত হয়েছে অধিকার ও দায়িত্ব। পিতা-মাতা সন্তানের জন্য যেমন দয়ার ছায়া, তেমনি সন্তানও পিতা-মাতার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের মাধ্যম হতে পারে। এই সম্পর্ক যদি ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তাহলে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রভাব পুরো সমাজে প্রতিফলিত হয়।

অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, যা মানবজীবনের সাফল্য ও পরিপূর্ণতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান গবেষণায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশদভাবে আলোচনা করা হবে, যাতে একটি আদর্শ ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব ও ধারণা

ইসলামে পরিবার মানবসমাজের মৌলিক ও সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো পরিবার। মানুষ জন্মের পর সর্বপ্রথম পরিবার থেকেই শিক্ষা, আদর্শ, নৈতিকতা ও জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা লাভ করে। তাই ইসলাম পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। কুরআন ও সুন্নাহতে পরিবারকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা, দয়া-মায়া ও নৈতিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার শুধু রক্তের সম্পর্কের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি পবিত্র বন্ধন, যা আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হলে দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে সফলতার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

ইসলামে পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হলো বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষ বৈধ ও পবিত্র সম্পর্কের আবদ্ধ হয় এবং একটি আদর্শ পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”
— সূরা আর-রূম : ২৩

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামী পরিবারব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো ভালোবাসা, দয়া ও পারস্পরিক শান্তি। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। তারা একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী এবং পরিবারকে সুন্দরভাবে পরিচালনার দায়িত্বশীল সদস্য।

ইসলাম পরিবারকে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ একটি ভালো পরিবার থেকেই আদর্শ সন্তান গড়ে ওঠে এবং সৎ ও নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবারে যদি ইসলামী মূল্যবোধ বজায় থাকে, তাহলে সমাজেও শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ইসলাম পরিবারে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে।

পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানদের সঠিক দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া, আদব-কায়দা শেখানো এবং উত্তম চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখা। অন্যদিকে সন্তানদের দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার করা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।”
— সূরা আল-ইসরা : ২৩

পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলামে এতটাই জোর দেওয়া হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাকে ঈমানের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া এবং বিপদে সাহায্য করা ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেন,
“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”
— সহীহ বুখারী

ইসলামে পরিবারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পারস্পরিক দায়িত্ববোধ। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। স্ত্রীর দায়িত্ব পরিবার পরিচালনা, সন্তান লালন-পালন ও স্বামীর সহযোগিতা করা। সন্তানদের দায়িত্ব পিতা-মাতার সেবা ও সম্মান করা। এভাবেই পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলাম পরিবারে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। পরিবারে মতভেদ বা সমস্যার সৃষ্টি হলে তা সুন্দর আচরণ ও পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান করতে বলা হয়েছে।

ইসলামী পরিবারব্যবস্থায় সন্তানদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত। তাই তাদের সঠিক শিক্ষা, নৈতিকতা ও ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেন,
"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"
— সহীহ মুসলিম

হযরত আবী উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের ওপর মাতা পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি এরশাদ করলেন "মাতা পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের মর্মার্থ হল- কোন ব্যক্তি তাদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারবেনা। সামাজিক জীবনে তাদের গুরুত্ব ছাড়া ও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে তাদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।

পিতা মাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা

ইহকালীন জীবনে পিতা মাতার গুরুত্ব কতটা অপরিসীম তা হয়তো একজন ইয়াতিম সন্তানই বুঝতে পারবে। পিতামাতাহীন একজন সন্তান জীবনে কঠিন লড়াই করে বেঁচে থাকে। সমাজে কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে সেই সন্তান থাকে মূল্যহীন। অপরদিকে যেই সন্তান পিতামাতার ছায়াতলে বড় হয় সেই সন্তানের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও তার জীবনকে মানুষ মূল্য দেয়। অসচ্ছলতা থাকা সত্বেও পিতা মাতারা সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ দিয়ে মানুষ করার আদর যত্নে বড় করার চেষ্টা করেন।

পার্থীব জীবনে পিতা মাতার গুরুত্ব এতটাই বহন করে। আর পরকালীন জীবনেও এই পিতা মাতা সন্তানদের জান্নাতে যাওয়ার কারণও হতে পারে ইনশাআল্লাহ।
ইসলামে পিতা মাতাকে ইহকালীন এবং পরকালীন সব ধরনের গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে। দুনিয়াতে পিতা মাতার আসন কতটা উপরে তা কোরআন হাদিসে বারবার উল্লেখিত হয়েছে।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে। (তিরমিযী হাদিস নং: ১৮৯৯)
মাতা পিতার অধিকার অস্বীকার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। যারা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাদের ক্রোধ উদ্রেককারীরা আল্লাহর গজব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেনা। এবং কে তাদেরকে অসন্তুষ্ট করবে? তারা আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে।

হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিআল্লাহুআনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জেহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা আর এই জন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার মাতা কি জীবিত? জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন জি হ্যাঁ আল্লাহর শোকর যে তিনি জীবিত আছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন তুমি ফিরে যাও এবং তার খিদমতেই লেগে থাকো কেননা তার পায়ের তলাতেই তোমার বেহেশত। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৫৫৩৮)

"তার পায়ের তলায় বেহেশত" কথাটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ হল তাকে পুরোপুরি সম্মান এবং আচার-আচরণে অত্যন্ত বিনয় দেখাতে হবে, মন প্রাণ দিয়ে তার খেদমত ও খিদমতকেই নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করতে হবে।

উপরের হাদিসে পিতার অনুগত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং এ হাদীসে মাতার আনুগত্য ও খিদমতের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই হাদিসে তীব্রতরভাবে নিজের মাতা ও পিতা উভয়ের কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বলেছেন আমি হুজুর সাঃ এর খিদমতে হাজির হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলআল্লাহ! জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা এবং আমি জানতে চাই আপনার মতামত। তিনি অর্থাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? আমি আরজ করলাম জি হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর উভয় জীবিত আছেন। তিনি (সঃ) বললেন তাদের খিদমতেই লেগে থাকো কেননা তাদের পায়ের নিচেই বেহেস্ত রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন যে, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক। পুনরায় অপমানিত হোক। আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথবা কোন একজনকে পেলো অতঃপর তাদের খেদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করলো না। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৫৫১)

এসব ঘটনাবলী এবং হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ইসলামে পিতা মাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটা উন্নীত। পিতা মাতার গুরুত্ব কোনো কিছুর সাথেই পৃথিবীতে তুলনা করা যায়না। যেখানে আমাদের আল্লাহ তাআলা পিতা মাতাকে এতটা সম্মান দিয়েছেন।

পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ

ইসলামে পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পিতা-মাতা আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে এর গুরুত্ব ইসলামে বুঝিয়ে শেষ করা যাবে না। যে মা দীর্ঘ ৯ মাসের বেশি গর্ভে ধারণ করেন সেই মায়ের প্রতিদান কোন কিছুর দ্বারাই দেওয়া সম্ভব না। তাছাড়া একজন পিতা তার সর্বোচ্চ শারীরিক শক্তি এবং মানসিক জ্ঞান দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করে সন্তানের জন্য ও পরিবারের জন্য উপার্জন করেন। এই ঋণ কিভাবে একজন সন্তান পরিশোধ করবে? এজন্যই পিতা-মাতাকে এত সম্মান দেওয়া হয়েছে। তারা সন্তানের ভালো আচরণ সুন্দর ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। একজন মা সন্তান ধারণ করার পর তার সমস্ত ধ্যান জ্ঞান সন্তানকে ঘিরেই হয়। মা শারীরিক বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে মানুষ বানানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন সেই সন্তান মায়ের সাথে সুন্দর আচরণ করবে এটাই স্বাভাবিক, এবং এটাই মায়ের হক্ব। একজন সন্তান তার পিতা মাতার সাথে উচ্চ ভাষায়, রুঢ় কণ্ঠে, চোখ তুলে কথা বলতে পারে না এটা তার জন্য ঘোর অন্যায় এবং মহা পাপের শামিল। আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার হুঁশিয়ার দিয়েছেন যে পিতা-মাতার সাথে অত্যন্ত সুন্দর আচরণ করতে। পৃথিবীতে যত সাহাবী, তাবে-তাবেয়ীন, সালাফে সালেহীন এবং বুজুর্গগণ ছিলেন সকলেই উনাদের পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করেছেন এবং উনাদের যথেষ্ট খিদমত এবং খেয়াল রেখেছেন। দুনিয়াতে ও আখেরাতে সফলতা অর্জন করার জন্য অবশ্যই পিতা-মাতার দুয়ার প্রয়োজন হয়। পিতা-মাতার দোয়া ছাড়া একজন সন্তান কখনোই দুনিয়াতেও সফলতা অর্জন করতে পারে না এবং আখিরাতেও সে ধ্বংস হয়।

আমাদের সাহাবী ও তাবে- তাবেয়ীন এবং বুজুর্গগনের পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণের কিছু ঘটনাঃ

হযরত উওয়াইস আল-কারনী (রহ.) তাঁর মায়ের খেদমতে সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। মায়ের সেবার কারণে তিনি রাসূল ﷺ–এর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেননি, তবুও আল্লাহর কাছে তিনি এত মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর কাছে দোয়া চাইতে বলেছেন। (সহীহ মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) পিতা-মাতার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁর মাকে কাঁধে বহন করে হজ করানোর পর জিজ্ঞেস করল, "আমি কি মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি?" তিনি উত্তরে বললেন, "না, প্রসবকালের একটি কষ্টেরও প্রতিদান তুমি দিতে পারনি।" (আল আদব আল মুফরাদ)

হযরত আলী ইবনে হুসাইন জয়নুল আবিদীন (রহ.) তাঁর মায়ের প্রতি এত বেশি আদব করতেন যে কখনো মায়ের সাথে একই পাত্রে খাবার খেতেন না। কারণ তিনি ভয় করতেন, মা হয়তো কোনো খাবার নিতে চেয়েছেন আর তিনি আগে নিয়ে ফেলবেন। (সিফাত আল সাফওয়াহ)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর মায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কোনো মাসআলায় তাঁর মা অন্য একজন আলেমের কথা শুনতে চাইলে তিনি নিজে বড় ইমাম হওয়া সত্ত্বেও মাকে নিয়ে সেই আলেমের কাছে যেতেন এবং মায়ের মন রক্ষা করতেন। (মানাকিব আবি হানিফা)

ইমাম বুখারী (রহ.) ছোটবেলায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর মা আল্লাহর কাছে অনেক কান্নাকাটি ও দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করে ইমাম বুখারী (রহ.)–এর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি মায়ের প্রতি গভীর সম্মান ও খেদমত আজীবন বজায় রাখতেন। (হাদি আল সারি)

পিতা মাতার খিদমত সম্পর্কে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কিছু নির্দেশিত ঘটনাঃ

"হযরত আমর ইবনুল আছ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, এক ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বললো, জী হাঁ। বরং আল্লাহর শোকর যে, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নিকট নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, জী হাঁ। আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ

করলেন, তাহলে মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো।"-মুসলিম

দীনে হিজরত ও জিহাদের যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা কে অস্বীকার করতে পারে? এ সত্ত্বেও যদি মাতা-পিতা বার্ধক্য, দুর্বলতা অথবা কোনো মাজুরীর কারণে সন্তানের সাহায্য ও খিদমতের মুখাপেক্ষী হন, তাহলে সন্তান তাঁদের খিদমত এবং আরাম প্রদান করে আল্লাহর প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষী হবে। আর তাতেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ ধরনের অসহায় অবস্থায় ইসলামে মাতা-পিতার সান্নিধ্যে থেকে খিদমত করা হিজরত ও জিহাদের মতো উত্তম আমলের চেয়েও অতি উত্তম কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি মাতা-পিতাকে কাঁদায়ে রেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যাও, মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে সেভাবে খুশি করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো।"-আবু দাউদ

তিনি আরো বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিহাদে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন? সে বললো, জী হাঁ। আল্লাহর শোকর যে, জীবিত আছেন। তিনি বললেন, যাও, তাঁদের খিদমত করতে থাকো। এটাই জিহাদ।

—মুসলিম, আবু দাউদ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ নেক আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে নামায সময় মতো পড়া হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশী প্রিয়? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি ফরমালেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"

—বুখারী ও মুসলিম

নামায়ের গুরুত্ব এবং ফযীলত সম্পর্কে কোনো মুসলমান অনবহিত নন। তারপরও নামায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সাথে সাথে প্রিয় নবী আলাইহি ওয়া সালাম যে নেক আমলের তাগিদ দিয়েছেন, দীনে তার কি ধরনের গুরুত্ব হতে পারে। মাতা-পিতা এবং সন্তানের মধ্যে তো সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের মধ্যে নেক আচরণ ও ভালোবাসার সম্পর্ক তো রক্তের সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রতিটি মুমিন মাতা-পিতাকে ভালোবেসেই থাকে এবং যথদূর সম্ভব মন ও অন্তর দিয়ে তাঁদের খিদমত করে। কিন্তু প্রিয় নবী আলাইহি ওয়া সালামের তাগিদের অর্থ হলো এ সম্পর্কে শুধু বংশীয় এবং ইহকালীন সম্পর্কই নয়। বরং এটা একটা দ্বীনি ব্যাপারও বটে। আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহর আনুগত্যের দাবিই হলো মাতা-পিতার সাথে নেক বা সুন্দর আচরণ করা। আল্লাহ ও রাসূল আলাইহি ওয়া সালামের নির্দেশ হলো যে, তাঁদের অনুগত থাকা এবং খিদমত করা। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বিভিন্নভাবে খুশী রাখার চেষ্টা করা। কোনো মুসলমান যদি মাতা-পিতার অনুগত না হয় তাহলে সে আল্লাহ ও রাসূল আলাইহি ওয়া সালামেরও অনুগত হয় না। সে শুধু বংশীয় ও ইহকালীন অপরাধীই নয়—বরং সে আল্লাহর নিকটও অপরাধী। আল্লাহর নিকট তাকে জবাবদিহিও করতে হবে।

মায়ের সাথে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর আচরণ:

একবার মারওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু দিনের জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছিলেন। সে সময় তিনি জূল হুলাইফায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর মাতা কিছু দূরে অন্য এক বাড়ীতে ছিলেন। যখনই তিনি বাইরে যাওয়ার ইরাদা করতেন, তখনই প্রথমে এসে মাতার দরজায় দাঁড়াতেন এবং বলতেন, প্রিয় আম্মাজান! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আম্মাজান ভেতর থেকে বলতেন, প্রিয় পুত্র! ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আম্মাজান! শৈশবকালে যেমন আপনি স্নেহ ও মমতা দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন তেমনি যেন আল্লাহ পাক আপনার উপর রহম করেন। তিনি জবাবে বলতেন, প্রিয় পুত্র! এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার সাথে যে ধরনের সুন্দর আচরণ করেছো এবং আরাম দিয়েছো আল্লাহও যেন তোমার প্রতি সে ধরনের রহমত নাযিল করেন।

অতঃপর তিনি যখন বাইরে থেকে আসতেন এবং ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তেমনিভাবে মাতাকে সালাম করতেন ও একই কথা বলতেন।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। তাদের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, সেবা ও আনুগত্য শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি মহান ইবাদতও বটে। বর্তমান যুগে পার্থিব ব্যস্ততা ও ব্যক্তিস্বার্থের কারণে অনেক সন্তান পিতা-মাতার অধিকার ভুলে যায়। অথচ একজন সন্তানের সফলতা কেবল দুনিয়াবী অর্জনে নয়; বরং পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যেও নিহিত। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত আন্তরিকতা, বিনয় ও ভালোবাসার মাধ্যমে পিতা-মাতার হক আদায় করা এবং তাদের সুখ-শান্তির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি সম্পর্ককে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে পরিচালনার শিক্ষা দেয়। সেই সম্পর্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোর একটি হলো পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক। পৃথিবীতে সন্তানের আগমনের মাধ্যম হলেন পিতা-মাতা। তারা অসীম কষ্ট, ত্যাগ ও ভালোবাসার মাধ্যমে সন্তানকে লালন-পালন করেন। এজন্য ইসলাম আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও দায়িত্ব পালনের কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে।

সম্মান ও মর্যাদা প্রদান

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের প্রথম দায়িত্ব হলো তাদের সম্মান করা। কথা-বার্তা, আচরণ, চলাফেরা ও ব্যবহার—সবক্ষেত্রে ভদ্রতা ও বিনয় বজায় রাখা আবশ্যক।
ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। আল্লাহ তাআলা নিজের ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, একজন সন্তানের জীবনে পিতা-মাতার সম্মান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তারা সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম, লালন-পালনের অভিভাবক এবং জীবনের প্রথম শিক্ষক। তাই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদা প্রদর্শন করা প্রত্যেক সন্তানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

পিতা-মাতার সম্মান করার অর্থ শুধু বাহ্যিকভাবে ভদ্র আচরণ করা নয়; বরং অন্তর থেকে তাদের মর্যাদা স্বীকার করা, তাদের কথা গুরুত্বের সাথে শোনা, তাদের সামনে বিনয়ী থাকা এবং এমন কোনো আচরণ না করা যাতে তারা কষ্ট পান। সন্তান যত বড়ই হোক না কেন, পিতা-মাতার সামনে নম্রতা ও শালীনতা বজায় রাখা ইসলামের শিক্ষা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।”

— আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা : ২৩

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভদ্রতা ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি বিরক্তির সামান্য শব্দ “উফ” বলতেও নিষেধ করা হয়েছে। কারণ পিতা-মাতার মনে সামান্য কষ্ট দেওয়াও ইসলামে অপছন্দনীয়।

সম্মান প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—পিতা-মাতার সামনে অহংকার না করা। বর্তমান যুগে অনেক সন্তান শিক্ষা, অর্থ বা সামাজিক অবস্থানের কারণে নিজেদেরকে বড় মনে করে পিতা-মাতার সাথে রূঢ় আচরণ করে। অথচ ইসলাম শিক্ষা দেয়, সন্তানের সব অর্জনের পেছনে পিতা-মাতার ত্যাগ ও দোয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই তাদের অসম্মান করা অকৃতজ্ঞতার শামিল।

রাসূল ﷺ পিতা-মাতার মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন—

“জান্নাত মায়ের পদতলে।”

— সুনানে নাসাঈ

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন—

“পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা।”
— জামে তিরমিযী

এই হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, পিতা-মাতার সম্মান ও সন্তুষ্টি অর্জন জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। তাই তাদের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা, অসম্মান করা, কষ্ট দেওয়া বা অবহেলা করা একজন মুসলিম সন্তানের জন্য অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

আনুগত্য করা

পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলোর একটি। সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার বৈধ আদেশ মেনে চলা, তাদের উপদেশ গ্রহণ করা এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা একজন মুমিনের দায়িত্ব। কারণ পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও সুন্দর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই অধিকাংশ নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। তাই ইসলাম পিতা-মাতার আনুগত্যকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসেবে গণ্য করেছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বলেন—

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।”
— আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত : ৮

পিতা-মাতার আনুগত্যের অর্থ হলো—তাদের সাথে নম্র আচরণ করা, তাদের কথাকে গুরুত্ব দেওয়া, তাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা এবং এমন কোনো কাজ না করা যাতে তারা কষ্ট পান। বিশেষ করে বার্ধক্যে পৌঁছালে তাদের প্রতি ধৈর্য ও সহানুভূতি আরও বেশি প্রয়োজন হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। সুতরাং তুমি চাইলে সেই দরজাকে সংরক্ষণ করো অথবা নষ্ট করো।”

— জামে তিরমিযী

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন জান্নাত লাভের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই তাদের অবাধ্যতা, অসম্মান বা কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

তবে ইসলামে আনুগত্যের একটি সীমারেখাও রয়েছে। যদি পিতা-মাতা এমন কোনো আদেশ দেন যা আল্লাহর অবাধ্যতা বা শরীয়তবিরোধী, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের কথা মানা জায়েজ নয়। কিন্তু তখনও তাদের সাথে অসদাচরণ করা যাবে না; বরং ভদ্রতা ও সম্মানের সাথে বিষয়টি এড়িয়ে চলতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে চাপ দেয়, যার কোনো জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না; তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো।”

— আল-কুরআন, সূরা লুকমান : ১৫

অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতার আনুগত্য শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একজন আদর্শ সন্তান সবসময় পিতা-মাতার সম্মান রক্ষা করে, তাদের উপদেশকে মূল্য দেয় এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে।

ভরণ-পোষণ ও সেবাযত্ন করা

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো তাদের ভরণ-পোষণ ও সেবাযত্ন করা। শৈশবে সন্তান যেমন পিতা-মাতার স্নেহ, ভালোবাসা ও পরিচর্যার

মুখাপেক্ষী থাকে, তেমনি বার্ধক্যে পিতা-মাতাও সন্তানের সহযোগিতা, যত্ন ও সহানুভূতির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। ইসলাম এই সময় তাদের পাশে দাঁড়ানোকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে।

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য নিজের আরাম-আয়েশ, সময় ও সম্পদ ত্যাগ করেন। সন্তানকে মানুষ করার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং নানা কষ্ট সহ্য করেন। তাই তারা বৃদ্ধ, অসুস্থ বা কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়লে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা সন্তানের কর্তব্য। তাদের প্রতি অবহেলা করা বা তাদেরকে বোঝা মনে করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।”
— আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা : ২৩

এই আয়াতে বিশেষভাবে বার্ধক্যে উপনীত পিতা-মাতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এ সময় তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, সহজেই কষ্ট পান এবং সন্তানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই ইসলাম সন্তানকে ধৈর্য, দয়া ও কোমল আচরণের মাধ্যমে তাদের সেবা করার নির্দেশ দিয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“আর দয়ার সাথে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনত করে দাও এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।’”
— আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা : ২৪

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, পিতা-মাতার সেবা শুধু বাহ্যিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি ভালোবাসা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। তাদের প্রতি করুণা ও নম্র আচরণ করা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

রাসূল ﷺ পিতা-মাতার সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন—

“ধ্বংস হোক তার, ধ্বংস হোক তার, ধ্বংস হোক তার।”
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! কে?”
তিনি বললেন, “যে তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে বার্ধক্যে পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।”
— সহীহ মুসলিম

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা জান্নাত লাভের অন্যতম বড় মাধ্যম। তাই সন্তানের উচিত তাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা, অসুস্থতায় সেবা করা, মানসিকভাবে সঙ্গ দেওয়া এবং সর্বদা তাদের আরাম ও শান্তির ব্যবস্থা করা।

বর্তমান সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অবহেলা করা হয় অথবা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অথচ ইসলাম পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। একজন আদর্শ সন্তান কখনো পিতা-মাতাকে বোঝা মনে করে না; বরং তাদের সেবাকে সৌভাগ্য ও নেক আমল হিসেবে গ্রহণ করে।

কোমল ভাষায় কথা বলা

ইসলাম পিতা-মাতার সাথে কোমল, ভদ্র ও সম্মানজনক ভাষায় কথা বলার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। একজন সন্তানের কথা, আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে পিতা-

মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পাওয়া উচিত। অনেক সময় কঠোর ভাষা, রূঢ় আচরণ বা বিরক্তিভাব পিতা-মাতার মনে গভীর কষ্ট সৃষ্টি করে। তাই ইসলাম সন্তানকে সবসময় ধৈর্য, নম্রতা ও শিষ্টাচারের সাথে কথা বলার শিক্ষা দিয়েছে।

পিতা-মাতা বয়সের কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন। তখন তারা অনেক বিষয় বারবার বলতে পারেন বা ছোটখাটো বিষয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে যেতে পারেন। এ অবস্থায় তাদের সাথে রাগান্বিত হওয়া বা বিরক্তি প্রকাশ করা একজন মুসলিম সন্তানের জন্য শোভনীয় নয়। বরং ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে তাদের কথা শুনতে হবে এবং সম্মানের সাথে জবাব দিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"আর দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।"
— আল-কুরআন, সূরা লুকমান : ১৫

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় উত্তম আচরণ করতে হবে। শুধু কাজের মাধ্যমে নয়, কথাবার্তার মাধ্যমেও তাদের সম্মান রক্ষা করা জরুরি।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উত্তম ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়ে বলেন—

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো।"
— আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ৮৩

যদি সাধারণ মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে পিতা-মাতার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ—তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

রাসূল ﷺ-ও কোমল আচরণ ও নম্র ভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।"
— সহীহ মুসলিম

অতএব, পিতা-মাতার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলা শুধু সামাজিক ভদ্রতা নয়; বরং এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও নৈতিক দায়িত্ব। একজন আদর্শ সন্তান কখনো পিতা-মাতার সাথে রূঢ় আচরণ করে না; বরং ভালোবাসা, ধৈর্য ও সম্মানের সাথে তাদের সাথে কথা বলে।

দু'য়া করা

ইসলাম শুধু আখিরাতের কল্যাণের জন্যই নয়, বরং দুনিয়াবী সুখ-শান্তি, সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্যও পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে উৎসাহ দিয়েছে। একজন সন্তান তার পিতা-মাতার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, মানসিক প্রশান্তি, হালাল রিযিক এবং বিপদমুক্ত জীবনের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে—এটিও তাদের হক আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

পিতা-মাতা সন্তানের সুখের জন্য সারাজীবন দুশ্চিন্তা ও কষ্ট সহ্য করেন। তাই তাদের জীবনের শান্তি, সুস্থতা ও কল্যাণ কামনা করা একজন সন্তানের নৈতিক ও ইসলামী দায়িত্ব। বিশেষ করে তারা অসুস্থ হলে, দুশ্চিন্তায় থাকলে অথবা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"আর বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।'"
— আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা : ২৪

এই দোয়ার মধ্যে শুধু আখিরাতের রহমত নয়; বরং দুনিয়াবী জীবনেও আল্লাহর দয়া, শান্তি ও কল্যাণ কামনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একজন সন্তান এভাবে দোয়া করতে পারে—
"হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতাকে সুস্থতা দান করুন, নেক হায়াত দান করুন, হিদায়ত ও রহমত দিন।তাদের জীবনে শান্তি ও বরকত দিন, সকল বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করুন এবং তাদের অন্তরকে প্রশান্ত রাখুন।"
পিতা-মাতা সন্তানের লালন-পালনের জন্য অসংখ্য ত্যাগ স্বীকার করেন। তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা। বিশেষ করে নামাযের পর, দোয়া কবুলের সময় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাদের জন্য রহমত, মাগফিরাত ও সুস্থতা কামনা করা উচিত।

হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর কাছে এ দোয়া করেছেন—

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যে মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাকে ক্ষমা করুন।"
— আল-কুরআন, সূরা নূহ : ২৮

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, নবীগণও পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতেন। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত নিয়মিতভাবে তাদের জন্য দোয়া করা।

রাসূল ﷺ পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আমল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের সুখ ও স্বস্তির জন্য দোয়া করা সদাচরণেরই একটি অংশ। কারণ দোয়া মুমিনের সবচেয়ে শক্তিশালী আমলগুলোর একটি।
বর্তমান ব্যস্ত জীবনে অনেক সময় সন্তানরা পিতা-মাতার সাথে বেশি সময় কাটাতে পারে না। কিন্তু আন্তরিক দোয়ার মাধ্যমে একজন সন্তান সবসময় তাদের কল্যাণ কামনা করতে পারে। এটি পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার এক সুন্দর প্রকাশ।

পিতা-মাতার আনুগত্যের চূড়ান্ত রূপ

“হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম-আহকাম এবং হেদায়াত মানা অবস্থায় সকাল করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা হবে। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন থাকেন, তাহলে যেন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি মাতা-পিতা তার সাথে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও।”-মিশকাত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকিদ দানের জন্য এ ধরনের বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে একজন মুমিনের সামনে এ তাৎপর্য প্রতিভাত হয় যে, আনুগত্য শুধু আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। মাতা-পিতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণও এজন্য যে, আল্লাহ মাতা-পিতার অধিকার বর্ণনা করেছেন এবং তা মেনে চলার ও খিদমতের নির্দেশ দিয়েছেন। মুমিন ব্যক্তি এমন কোনো ব্যাপারে অবশ্যই মাতা-পিতার আনুগত্য করবে না যাতে আল্লাহর নাফরমানী হয়।

মাতা-পিতার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সুন্দর আচরণের অর্থ হলো, যদি মাতা- পিতা কঠোর মেজাজের কারণে এমন সব দাবী করতে থাকেন, যা পূরণ করা সন্তানের জন্য কঠিন হয় অথবা সন্তানদের সহ্যের সীমার কথা চিন্তা না করে বেশী বেশী পরিশ্রম করাতে থাকেন অথবা সন্তানদের সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত আর্থিক দাবী করতে থাকেন তাহলেও সন্তানদের উচিত নিজেদের আবেগ কাবুতে রেখে এবং জোর করে তাদের খিদমত ও সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখা।

এ অবস্থায় যদিও সন্তানের উপর আনুগত্য ওয়াযিব নয়। কেননা আল্লাহ কারোর উপর সাধ্য বা সামর্থ্যের বেশী বোঝা আরোপ করেন না, তবুও মাতা-পিতার আনুগত্যের এটাই চূড়ান্ত রূপ। সন্তান নিজের সামর্থ্যের বাইরে মাতা-পিতার খিদমতে নিজের জীবন বিলিয়ে দেবে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ও আরাম প্রদানের জন্য সব কিছুই ত্যাগ করবে।

হ্যাঁ, যদি এমন দাবী করেন যাতে অন্যের অধিকার খর্ব হয়, অথবা তার বিস্বাদপূর্ণ প্রভাব অন্যের উপর আপতিত হয় অথবা আল্লাহর কোনো হুকুমের বিরোধিতা হয় তাহলে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, তারা কারোর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে বাধা দান করে অথবা নীরেট ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা জিদের বশবর্তী হয়ে কন্যাকে বিনা কারণে এমন স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনে বাধ্য করতে চায় যে স্ত্রীর শরীয়তের অধিকার আদায়ে কার্পণ্য করে না। অথবা এ ধরনের স্বামীর খিদমত ও আনুগত্যে বাধা দেয়। তাহলে এ ধরনের মাতা-পিতার আনুগত্য অবশ্যই ওয়াযিব নয়। সম্পর্ক রাখার প্রশ্নেও একটি জিনিস সামনে রাখতে হবে। তাহলো, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা এবং তাদের সুন্দর সম্পর্ক আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্য পসন্দনীয় কাজ। আর ইসলাম যে কোনো মূল্যে এ সম্পর্ক কায়েম রাখ তাকিদ দেয়।
নিসন্দেহে মাতা-পিতার আনুগত্য করা ফরয কিন্তু এ আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের অধীন। এটা কোনো স্বাধীন আনুগত্য নয়। দীনের হেদায়াত, আহকাম, দাবী এবং মুসলিহাত থেকে পিছপা হয়ে মাতা পিতার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য নয় বরং এটা আল্লাহর নাফরমানী। এ ধরনের আনুগত্য করে কোনো মুমিন সওয়াবের আশা করতে পারেন না। শাস্তিই তার প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যদি একজনের আনুগত্য হয় তাহলে জান্নাতের এক দরজা খোলা থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, মাতা-পিতার মধ্যে যদি কেউ ইন্তিকাল করেন এবং এখন আর তার আনুগত্যের ও খিদমতের সুযোগ নেই, তাহলে এ ধরনের সন্তানের জন্য ব্যাস একটি দরজাই খোলা রয়েছে, বরং তার মর্মার্থ হলো, যদি মাতা-পিতার মধ্য থেকে একজনের আনুগত্য করছে এবং অন্যজনকে অসন্তুষ্ট রেখেছে তাহলে একজনের আনুগত্যের জন্য বেহেশতের দরজা খোলা রয়েছে

এবং অন্যের নাফরমানীর জন্য দোযখের দরজা খোলা রাখা হয়েছে। যদি উভয়ের মধ্য থেকে একজন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এবং জীবিতাবস্থায় তার আনুগত্য করা হয়েছে তাহলে এ আনুগত্যের বিনিময়ে খোলা দরজা খোলাই থাকবে তা বন্ধ করা হবে না।

হাদীসটিতে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ একজনের আনুগত্য করে এবং অন্যজনকে নিজের কাজের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট রাখে তাহলে তা সঠিক নয়। 'একজনের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ জান্নাতের দরজা খুলে রাখেন। কিন্তু অন্যজনের নাফরমানীর কারণে স্বয়ং জাহান্নামের দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। একজনের আনুগত্য করে অন্যজনের খিদমত ও আনুগত্য প্রশ্নে নিশ্চিত থাকা কোনো মুমিনের সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। সেতো উভয়ের খিদমত ও আনুগত্য করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়।

পিতা মাতার হক্ব ও অধিকার

সন্তান লালন-পালনে মাতা-পিতা উভয়েরই অংশ থাকে। উভয়েই নিজের আরাম-আয়েশ কুরবানী করে সন্তান প্রতিপালন করেন। পিতা শরীরের ঘামের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ সন্তানের জন্য ব্যয় করেন এবং মাতা কলিজার রক্ত পান করিয়ে করিয়ে তাকে পালেন। উভয়ের সম্মিলিত ভালোবাসা, চেষ্টা ও মমতায় সন্তান লালিত-পালিত হয়। এজন্যেই কুরআন ও সুন্নাহতে উভয়ের সাথেই সুন্দর আচরণের তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং উভয়কেই খিদমত ও আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর উভয়রেই সন্তানের প্রতি হক্ব এবং অধিকার রয়েছে।

আল্লাহর হক হলো মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক করবে না। বান্দার হকের মধ্যে পিতা–মাতার হক সর্বাগ্রে। সন্তানের প্রতি পিতা–মাতার হক বা অধিকার হলো সন্তান পিতা–মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের কষ্ট দেবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে শরিক করো না এবং পিতা–মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।’

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

(সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ৩৬)।

‘আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে, তার পিতা–মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার।’
﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾
(সুরা-৪৬ আহকাফ, আয়াত: ১৫)।

‘আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যে তুমি আমার এবং তোমার পিতা–মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।’
﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾
(সুরা-৩১ লুকমান, আয়াত: ১৪)।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ- ۔
“লোকজন 'আপনাকে জিজ্ঞেস করে থাকে, আমরা কি খরচ বা ব্যয় করবো। জবাবে বলে দিন, যে মালই তোমরা খরচ করো তার প্রথম হকদার হলো মাতা-পিতা।"-সূরা আল বাকারা: ২১৫

কুরআন ও সুন্নাতে যেভাবে মাতা-পিতার খিদমত, আনুগত্য এবং সুন্দর আচরণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেমনি মাতা-পিতার উপর খরচ না করে ধন-সম্পদ বাঁচানো সঠিক নয় বলেও তাকিদ দেয়া হয়েছে। বরং সর্বপ্রথম তাদের উপরই খরচ করতে হবে। আর তাঁরা যদি অভাবগ্রস্ত হন তাহলে জবরদস্তি করেই নিতে পারেন। যদি কেউ মাতা-পিতার খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শনে কমতি না করেও অর্থ খরচ করতে না চায়, তাহলে সেটাও ঠিক হবে না। যেভাবে সন্তানের উপর তাদের অধিকার রয়েছে তেমনি সন্তানের সম্পদের উপরও তাঁদের অধিকার আছে।

একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি এলো এবং নিজের পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো ইচ্ছা হলেই সে আমার সম্পদ নিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ব্যক্তির পিতাকে ডাকলেন। লাঠির উপর ভর দিয়ে এক দুর্বল বৃদ্ধ এসে হাজির হলো। তিনি বৃদ্ধকে সব জিজ্ঞেস শুরু করলে সে বললোঃ আল্লাহর রাসূল! এক যুগ ছিলো যখন এ দুর্বল আরো অসহায় ছিলো এবং আমি শক্তি সম্পন্ন ছিলাম। আমি বিত্তশালী ছিলাম। আর সে ছিলো কপর্দক শূন্য। আমি কখনো তাকে আমার সম্পদ নেয়ায় বাধা দিইনি আজ আমি দুর্বল। সে

সুঠাম ও শক্তিশালী। আমি কপর্দক শূন্য। বিত্তশালি। এখন সে নিজের সম্পদ আমাকে দেয় না।

একথা শুনে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে দিলেন এবং বললেন, "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।"

মোটাদাগে পিতা মাতার হক্ব এবং অধিকারে ১৪টি বিষয় রয়েছে। ওনাদের জীবিতকালে ৭ টি এবং মৃত্যু পরবর্তীতে ৭ টি।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য হলো

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,

৪. সেবাযত্ন করা,

৫. সুখ-শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,

৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও

৭. দূরে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো

১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,

২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,

৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,

৪. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা,

৫. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও

৭. কবর জিয়ারত করা।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য-

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা

পিতা–মাতার সাথে সর্বদা সম্মানজনক আচরণ করা সন্তানের প্রধান দায়িত্ব। তাঁদের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা, রূঢ় আচরণ করা বা কষ্টদায়ক কথা বলা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।"
— সূরা আল-ইসরা : ২৩

তাঁদের সামনে আদব রক্ষা করা, ভদ্রভাবে কথা বলা, বসা–উঠায় শিষ্টাচার বজায় রাখা— এসবই সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। পিতা–মাতার সম্মান রক্ষা করা সন্তানের ঈমানি দায়িত্ব।

২. ভালোবাসা

পিতা–মাতার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করা এবং তা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা জরুরি। শুধু মুখে ভালোবাসা বলাই যথেষ্ট নয়; বরং তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া, তাঁদের খুশি রাখার চেষ্টা করা এবং কষ্ট না দেওয়া প্রকৃত ভালোবাসার পরিচয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতা–মাতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ বলেছেন। তাই তাঁদের প্রতি হৃদয়ে মমতা রাখা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা নেক আমল।

৩. মান্য করা

পিতা–মাতার বৈধ আদেশ মেনে চলা সন্তানের কর্তব্য। তাঁরা যদি শরিয়তবিরোধী কোনো নির্দেশ না দেন, তাহলে তাঁদের কথা মানা ওয়াজিবস্বরূপ দায়িত্ব। তবে কোনো বিষয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা হলে সেখানে তাঁদের অনুসরণ করা যাবে না।

তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, অবজ্ঞা না করা এবং বিনয়ের সাথে নিজের কথা উপস্থাপন করা একজন আদর্শ সন্তানের বৈশিষ্ট্য।

৪. সেবাযত্ন করা

পিতা–মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের সেবা করা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমল। অসুস্থতা, দুর্বলতা বা অক্ষমতার সময়ে ধৈর্যসহকারে তাঁদের যত্ন নেওয়া জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম।

খাবার দেওয়া, ওষুধের ব্যবস্থা করা, শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করা, একাকীত্ব দূর করা—এসবই সেবাযত্নের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

৫. সুখ–শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা

পিতা–মাতার মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তির দিকে খেয়াল রাখা সন্তানের দায়িত্ব। এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যা তাঁদের দুশ্চিন্তা বা কষ্টের কারণ হয়।

তাঁদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, পারিবারিক পরিবেশ সুন্দর রাখা, প্রয়োজনীয় আরাম–আয়েশের ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের মন ভালো রাখার চেষ্টা করা সন্তানের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

৬. প্রয়োজন পূরণ করা

পিতা–মাতার আর্থিক ও দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করা সন্তানের দায়িত্ব। যদি তাঁরা অসচ্ছল হন, তাহলে তাঁদের ভরণপোষণ করা সন্তানের ওপর আবশ্যক।

খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতা করা শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়; বরং ইসলামী কর্তব্যও বটে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের প্রয়োজন উপেক্ষা করা গুনাহের কাজ।

৭. দূরে থাকলে দেখা–সাক্ষাৎ করা

যারা পিতা–মাতার থেকে দূরে থাকে, তাঁদের উচিত নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া এবং সুযোগ হলে দেখা করতে যাওয়া। বর্তমান যুগে ফোন, বার্তা বা ভিডিও কলের মাধ্যমেও তাঁদের সাথে যোগাযোগ রাখা জরুরি।

দীর্ঘদিন যোগাযোগ না রাখা বা অবহেলা করা তাঁদের মনে কষ্ট দেয়। তাই দূরে থাকলেও সম্পর্ক ও আন্তরিকতা বজায় রাখা সন্তানের দায়িত্ব।

ইন্তেকালের পর পিতা–মাতার প্রতি ৭টি করণীয়-

১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা
পিতা–মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দোয়া করা সন্তানের অন্যতম বড় দায়িত্ব। কুরআনে দোয়া শেখানো হয়েছে—

“হে আমার রব! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।”
— সূরা আল-ইসরা : ২৪

সন্তানের দোয়া মৃত পিতা–মাতার জন্য উপকারী হয় এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা
নফল ইবাদত, সদকা, কুরআন তিলাওয়াত বা অন্যান্য নেক আমলের সওয়াব পিতা–মাতার উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেওয়া উত্তম কাজ। এর মাধ্যমে তাঁরা কবরে উপকৃত হন বলে আলেমগণ উল্লেখ করেছেন।

বিশেষ করে সদকায়ে জারিয়া, দান–খয়রাত বা দ্বীনি কাজে সহযোগিতা তাঁদের জন্য চলমান সওয়াবের কারণ হতে পারে।

৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা
পিতা–মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রিয় মানুষদের সম্মান করা তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহারের অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতা–মাতার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাকে উত্তম আচরণ বলেছেন।

এতে পিতা–মাতার স্মৃতি ও সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—
“সর্বোত্তম সদাচরণ হলো, মানুষ তার পিতার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।”
— সহীহ মুসলিম

৪.তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য–সহযোগিতা করা
যেসব আত্মীয় বা পরিচিত মানুষের সাথে পিতা–মাতার সুসম্পর্ক ছিল, তাঁদের সহযোগিতা করা এবং খোঁজখবর নেওয়া সন্তানের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

এতে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হয় এবং পিতা–মাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে।

৫. তাঁদের ঋণ পরিশোধ ও আমানত প্রত্যর্পণ করা
যদি পিতা–মাতার কোনো ঋণ থেকে যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার চেষ্টা করা উচিত। একইভাবে তাঁদের কাছে কারও আমানত থাকলে যথাযথভাবে ফেরত দেওয়া আবশ্যক।

মানুষের হক আদায় না হলে মৃত ব্যক্তির ওপর দায় থেকে যায়। তাই এসব বিষয়ে দায়িত্বশীল হওয়া জরুরি।

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা
পিতা–মাতা শরিয়তসম্মত কোনো অসিয়ত করে গেলে তা বাস্তবায়ন করা সন্তানের কর্তব্য। যেমন—দান করা, কোনো ভালো কাজ সম্পন্ন করা বা কারও হক আদায় করা ইত্যাদি।

তবে অসিয়ত অবশ্যই ইসলামী শরিয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে।

৭. কবর জিয়ারত করা

পিতা–মাতার কবর জিয়ারত করলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় এবং তাঁদের জন্য দোয়া করার সুযোগ পাওয়া যায়। কবর জিয়ারতের সময় তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করা উচিত।

এটি সন্তানের হৃদয়ে পিতা–মাতার প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত রাখে।

পিতা–মাতার সাথে অবাধ্যতার পরিণতি

ইসলামে পিতা–মাতার মর্যাদা অত্যন্ত মহান ও সম্মানজনক। মহান আল্লাহ তাআলা নিজের ইবাদতের সাথে পিতা–মাতার হকের বিষয়টিকে এমনভাবে যুক্ত করেছেন, যা তাঁদের মর্যাদার গভীরতা স্পষ্ট করে। একজন মানুষের পৃথিবীতে আগমনের পর সবচেয়ে বেশি কষ্ট, ত্যাগ ও ভালোবাসা যাঁরা প্রদান করেন, তাঁরা হলেন পিতা–মাতা। সন্তানের সুখের জন্য তাঁরা নিজেদের আরাম–আয়েশ বিসর্জন দেন, রাতের ঘুম হারাম করেন, নিজেদের প্রয়োজনকে পিছনে ফেলে সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা করেন। তাই তাঁদের সম্মান করা, কথা মানা ও হৃদয়ে স্থান দেওয়া শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

অপরদিকে পিতা–মাতার অবাধ্যতা, তাঁদের কষ্ট দেওয়া, অসম্মান করা বা অবজ্ঞা করা ইসলামে জঘন্য কবিরা গুনাহ হিসেবে গণ্য। কুরআন, হাদিস এবং আকাবীর আলেমদের বাণীতে এর ভয়াবহ পরিণতির কথা অত্যন্ত কঠোরভাবে বর্ণিত হয়েছে। অনেক সময় মানুষ দুনিয়াতে এর শাস্তি ভোগ করে এবং আখিরাতে আরও কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হয়।

কুরআনের আলোকে পিতা–মাতার অবাধ্যতার ভয়াবহতা:

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থঃ

“তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাঁদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদেরকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না, ধমক দিও না এবং তাঁদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর দয়া ও মমতা সহকারে তাঁদের প্রতি বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো— হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।”

— সূরা আল-ইসরা : ২৩-২৪

এই আয়াতে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার প্রতি সামান্য বিরক্তি প্রকাশকেও নিষিদ্ধ করেছেন। “উফ” শব্দটি খুব ছোট ধরনের বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ। যখন এতটুকু কষ্ট দিতেও নিষেধ করা হয়েছে, তখন গালি দেওয়া, অপমান করা, রাগারাগি করা বা তাঁদের চোখের পানি ফেলানো কত বড় অপরাধ—তা সহজেই অনুমেয়।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

অর্থঃ

“আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।”

— সূরা লুকমান : ১৪

এই আয়াতে আল্লাহ নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকর আদায়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবদান অস্বীকার করে, সে প্রকৃত কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে না।

হাদিসের আলোকে পিতা–মাতার অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জানাব না?”

সাহাবিগণ বললেন, “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!”

তিনি বললেন, “আল্লাহর সাথে শরিক করা এবং পিতা–মাতার অবাধ্য হওয়া।”

— সহিহ বুখারি

এই হাদিসে শিরকের পরই পিতা–মাতার অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে এ গুনাহ কত ভয়াবহ।

আরেক হাদিসে এসেছে—

“পিতা–মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।”

— তিরমিজি

অর্থাৎ পিতা–মাতাকে কষ্ট দেওয়া মানে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করা। মানুষ যত ইবাদতই করুক, যদি পিতা–মাতার হক নষ্ট করে, তবে তা তার জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন—

“তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্যই কবুল হয়— মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা–মাতার দোয়া।”

— আবু দাউদ

এ হাদিস সন্তানের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সতর্কবার্তা। পিতা–মাতার অন্তরের কষ্ট ও বদদোয়া মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে।

আকাবীরদের দৃষ্টিতে পিতা–মাতার অবাধ্যতার পরিণতি:

ইসলামের মহান মনীষী, বুযুর্গ ও আকাবীর আলেমগণ সবসময় পিতা–মাতার খেদমত ও আনুগত্যের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন, পিতা–মাতার অবাধ্যতার ক্ষতি শুধু আখিরাতে নয়; বরং দুনিয়াতেও প্রকাশ পায়।

১. জীবনের বরকত নষ্ট হয়ে যায়

ইমাম গাজ্জালী বলেন, পিতা–মাতার সন্তুষ্টি মানুষের জীবনে রহমত ও বরকত বয়ে আনে। আর তাঁদের কষ্ট মানুষের জীবন থেকে শান্তি ও বরকত কেড়ে নেয়।

তারা প্রচুর সম্পদ, খ্যাতি বা ক্ষমতা পেলেও শান্তি ও সুখ খুঁজে পায় না। এমন সন্তানদের দুনিয়ার জীবনেই বিপর্যয় নেমে আসে। হ্যা, আমরা হয়ত বরকত বলতে শুধু টাকা, পয়সা, জমি-জমা, ধন সম্পদ বুঝে থাকি কিন্তু আমদের দেশেই বহু মানুষ আছে যাদের কোটি কোটি টাকা আছে কিন্তু সুখ, শান্তি নামক শব্দটা নেই। সুখ, শান্তি আর অঢেল ধনসম্পদ দুটো ভিন্ন জিনিস। আজ হয়ত আমি শিখরে ওঠে ভাবতেই পারি আমার শিখরে ওঠাতে কারো ভূমিকা নেই কিন্তু সেই শিখর থেকে শিকরে নামাতে আল্লাহর এক সেকেন্ডও সময় লাগবে না। তাই বরকতময় জীবন লাভের অন্যতম শর্ত হলো জীবদ্দশায় পিতামাতাকে পেলে তাদেরকে উত্তম সদাচারণ উপহার দেওয়া। অনেক মানুষকে দেখা যায়— প্রচুর অর্থসম্পদ থাকা সত্ত্বেও জীবনে শান্তি নেই, সংসারে অশান্তি, মানসিক অস্থিরতা ও অজানা সংকটে ভুগছে। আকাবীররা বলেন, এর অন্যতম কারণ হতে পারে পিতা–মাতার হক নষ্ট করা।

২. ইবাদতের নূর ও প্রভাব কমে যায়

পিতা–মাতার অবাধ্য ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে নামাজ, রোজা বা অন্যান্য ইবাদত করলেও তার অন্তরে ইবাদতের প্রকৃত নূর অনেক সময় আসে না। কারণ বান্দার হক নষ্ট করা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন—

“একজন মানুষ অনেক নফল ইবাদত করতে পারে, কিন্তু পিতা–মাতার কষ্টের কারণে সে বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।”

৩. দোয়া কবুলে বাধা সৃষ্টি হয়

আকাবীররা বলেন, পিতা–মাতার কষ্ট নিয়ে জীবনযাপন করলে অনেক সময় মানুষের দোয়া দ্রুত কবুল হয় না। কারণ যে ব্যক্তি নিজের সবচেয়ে আপন মানুষদের কষ্ট দেয়, তার হৃদয়ে প্রকৃত রহমত ও বিনয় কমে যায়।

বিশেষ করে বৃদ্ধ পিতা–মাতার চোখের পানি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। অনেক বুযুর্গ বলেছেন, মজলুমের দোয়া যেমন কবুল হয়, তেমনি কষ্ট পাওয়া পিতা–মাতার দোয়াও দ্রুত আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়।

৪. মৃত্যুর সময় কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে

বহু বুযুর্গ ও আলেমের বর্ণনায় এসেছে, পিতা–মাতার অবাধ্যতার কারণে মৃত্যুকালে মানুষের জন্য কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। কেউ কেউ কালিমা পাঠ করতে কষ্ট অনুভব করে, কেউ অস্থিরতার মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।

যদিও সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তবুও আকাবীররা এটিকে অত্যন্ত ভয়াবহ গুনাহ হিসেবে দেখেছেন এবং সবসময় এ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

৫. আখিরাতে কঠিন জবাবদিহি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“পিতা–মাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

— নাসাঈ (অর্থগত বর্ণনা)

অর্থাৎ এ গুনাহ মানুষের আখিরাত ধ্বংস করে দিতে পারে যদি সে তওবা না করে এবং পিতা–মাতার হক আদায় না করে।

৬. নিজের সন্তান থেকেও অবাধ্যতা পাওয়ার আশঙ্কা

আকাবীরদের একটি বিখ্যাত কথা হলো—

"তুমি তোমার পিতা–মাতার সাথে যেমন আচরণ করবে, তোমার সন্তানও তোমার সাথে তেমন আচরণ করবে।"

মানুষ যখন নিজের পিতা–মাতাকে অবহেলা করে, তখন অনেক সময় আল্লাহ তাকে একই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। ফলে বার্ধক্যে এসে সে নিজেও অবহেলা ও কষ্টের শিকার হয়।

কোরআনের এক আয়াতে এর ইঙ্গিত আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সৎ কাজ করল সে তা তার ভালোর জন্যই করল।

আর যে মন্দ কাজ করল সে অবশ্যই এর প্রতিফল ভোগ করবে। তোমার রব তাঁর বান্দাদের ওপর কোনো জুলুম করেন না।'

(সুরা : হামিম আস-সাজদা, আয়াত : ৪৬

পিতা–মাতাকে কষ্ট দেওয়ার কিছু সাধারণ রূপ

বর্তমান সমাজে অনেকেই বুঝে বা না বুঝে পিতা–মাতাকে কষ্ট দেয়। যেমন—

উচ্চস্বরে কথা বলা
রাগ দেখানো বা ধমক দেওয়া
তাঁদের মতামতকে তুচ্ছ করা
বৃদ্ধ বয়সে বিরক্তি প্রকাশ করা
তাঁদের খোঁজখবর না নেওয়া
স্ত্রী বা স্বামীর কারণে তাঁদের অপমান করা
আর্থিকভাবে সক্ষম হয়েও তাঁদের প্রয়োজন পূরণ না করা
তাঁদের সামনে মোবাইল বা অন্য কাজে ব্যস্ত থেকে অবহেলা করা
তাঁদের দোয়া ও আবেগকে গুরুত্ব না দেওয়া

এসব বিষয় ছোট মনে হলেও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে।

ইসলামে মা-বাবার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মা-বাবার অবাধ্য হলে ইহকালে ও পরকালে বহু ক্ষতি হয়।

মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তির রিজিকে সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোনো বরকত হয় না। আবু হুরায়রা (রা.) ও আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রিজিকে প্রশস্ততা কামনা করে এবং বয়সে বরকত চায়, তার উচিত সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

(বুখারি, হাদিস : ২০৬৭, মুসলিম, হাদিস : ২৫৫৭)

কারো জন্য নিজ মা-বাবার চেয়ে নিকটাত্মীয় আর কেউ নেই। তাই মা-বাবার আনুগত্য রিজিকে ও হায়াতে বরকতের কারণ।

মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, রবের সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে। (তিরমিজি, হাদিস : ১৮৯৯)

কোনো সন্তান তার মা-বাবার অবাধ্য হওয়ার কারণে মা-বাবা তাকে কোনো বদদোয়া বা অভিশাপ দিলে তা তার সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, তিনটি দোয়া কখনো নামঞ্জুর করা হয় না— সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া, রোজাদারের দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৯৮)

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি (সা.) একদিন তিনবার বললেন, 'সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহগুলো সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করব না?' সবাই বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, অবশ্যই বলুন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা এবং মা-বাবার অবাধ্য হওয়া।' (বুখারি)

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তিন ব্যক্তির প্রতি মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টি দেবেন না। এক. মা-বাবার অবাধ্য সন্তান। দুই. পুরুষের বেশধারী নারী এবং তিন. দাইয়ুস (পরিবারকে নাফরমানির অনুমতি দাতা)। আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না—এক. মা-বাবার অবাধ্য সন্তান। দুই. মাদকাসক্ত ব্যক্তি। তিন. দানকৃত বস্তুর খোঁটা দানকারী ব্যক্তি।' (নাসায়ি)

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া একটি গুরুতর অপরাধ।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ‘আমর বিন্ ‘আস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ.

“কবীরা গুনাহগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক করা, ইচ্ছাকৃত মিথ্যে কসম খাওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা”। (বুখারী ৬৮৭০)

মুগীরা বিন্ শু’বাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন মায়ের অবাধ্যতা, জীবিত মেয়েকে দাফন করা, কারোর প্রাপ্য না দেয়া ও নিজের পাওনা নয় এমন বস্তু কারোর নিকট চাওয়া। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন যে কোন শুনা কথা বলা, বেশি বেশি চাওয়া ও সম্পদ বিনষ্ট করা”। (বুখারী ২৪০৮, ৫৯৭৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمَرٍ.

“তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা: যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি”।(জা’মিউস্ সাগীর : ৬/২২৮)

তিনি আরো বলেন:

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ..

“তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা‘আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি”। (জা’মিউস্ সাগীর : ৩/৬৯)

তিনি আরো বলেন:

لَا يَدْخُلُ حَائِطَ الْقُدْسِ سِكِّيْرٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ.

“তিন ব্যক্তি বাইতুল্ মাক্বদিসে প্রবেশ করতে পারবেনা: অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়”। (সিল্সিলাতুল্ আহা’দীসিস্ সাহীহাহ্ : ২/২৮৯)

মাতা-পিতার অবাধ্যতার সরূপ:

মাতা-পিতার অবাধ্যতা দু’ ধরনের: হারাম ও মাকরূহ্।

ক. হারাম অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যেমন:

মাতা-পিতা সন্তানের উপর কোন ব্যাপারে কসম খেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত কসমটি রক্ষা করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট প্রয়োজনীয় কিছু চেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত চাহিদা পূরণ করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট কোন কিছু আশা করেছেন। অথচ সে তাদের উক্ত আশা ভঙ্গ করেছে।

মাতা-পিতা সন্তানকে কোন কাজের আদেশ করেছেন। অথচ সে তাদের উক্ত আদেশটি মান্য করেনি।

মাতা-পিতাকে মেরে, গালি দিয়ে বা কারোর নিকট তাদের গীবত বা দোষ চর্চা করে তাদেরকে কষ্ট দেয়া সর্বোচ্চ নাফরমানি। তবে গুনাহ্’র কাজে তাদের কোন আনুগত্য করা যাবে না।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

»وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وَصَاحِبْهُمَا فِيْ الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا، وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ«

“তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই তথা কুর‘আন ও হাদীসের কোন সাপোর্ট নেই তাহলে তুমি এ ব্যাপারে তাদের কোন আনুগত্য করবেনা। তবে তুমি এতদ্সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং সর্বদা তুমি আমি (আল্লাহ্) অভিমুখী মানুষের পথ অনুসরণ করবে। কারণ, পরিশেষে তোমাদের সকলকে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই অবগত করবো”। (লুক্বমান : ১৫)

খ. মাকরূহ্ অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যেমন:

আপনার পিতা খাবার শেষ করেছেন। এখন তিনি হাত ধুতে চাচ্ছেন এবং তিনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাতও ধুয়েছেন। আপনি শুধু তা দেখেই আছেন। কিছুই করেননি। এতে আপনি পিতার অবাধ্য হননি।

তবে কাজটি আরো ভালো হতো যদি আপনি আপনার কাজের ছেলেকে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতে বলতেন।

কাজটি আরো ভালো হতো যদি আপনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতেন।

তবে আপনার পিতা যদি দাঁড়াতে না পারেন অথবা দাঁড়াতে কষ্ট হয় অথবা আপনার পিতা স্বয়ং আপনাকেই পানি উপস্থিত করতে আদেশ করলেন এবং আপনি আদেশটি পালন করলেন না তখন কিন্তু আপনি আপনার পিতার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন।

অবাধ্যতার আরো কিছু দৃষ্টান্ত:

১. মাতা-পিতার নিকট আপনি কখনো বসছেন না। তাদের ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন না। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই করছেন না এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিছু জানতেও চাচ্ছেন না।

২. তারা আপনার যে যে ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন সে ব্যাপারে আপনি তাদের নিকট কোন পরামর্শও চাচ্ছেন না। কারণ, কিছু কিছু ব্যাপার তো এমনো থাকতে পারে যে তারা সে ব্যাপারে আপনাকে কোন পরামর্শ দেয়ারই যোগ্যতা রাখেন না। তখনো কিন্তু আপনি সে ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে তাদের মতামত চাইতে পারেন। তখন অবশ্যই তারা এ পরামর্শ সমর্থন করবেন এবং আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

৩. কোথাও যাওয়ার সময় আপনি তাদের অনুমতি চাচ্ছেন না অথবা ঘর থেকে বেরনোর সময় আপনি তাদেরকে জানিয়ে বেরুচ্ছেন না।

৪. সহজভাবে তাদের যে কোন খিদ্মত আঞ্জাম দেয়ার আপনার কোন সদিচ্ছাই নেই। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিকট অপারগতা প্রকাশ করতে আপনি খুবই তৎপর। আপনি কখনো এ কথা জানতে চাচ্ছেন না যে, তারা আমার এ অপারগতার কথা বিশ্বাস করছেন কি? নাকি আপনার অপারগতার কথা তারা প্রত্যাখ্যানই করছেন। নাকি তারা শুধু আপনার কথা শুনেই চুপ থাকলেন। আপনার উপর অসন্তুষ্টির কারণে পরিষ্কার কিছু বলছেননা। কারণ, আপনি মনে করছেন, তারা আমার অপারগতার কথা শুনেই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অথচ ব্যাপারটি অন্য রকমও হতে পারে।

৫. আপনার প্রয়োজনকেই আপনার মাতা-পিতার প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিলেন। যেমন: আপনাকে তারা কোন কাজের আদেশ করলেন। উত্তরে আপনি বললেন: এখন আমার একটুও সময় নেই। সময় পেলেই তা করে ফেলবো।

৬. নিজকে আপনার মাতা-পিতার চাইতেও বড় মনে করলেন। তা সাধারণত হয়ে থাকে যখন আপনি সামাজিক কোন সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন অথবা মাতা-পিতা

অপেক্ষা আপনি বেশি নেককার। যেমন: আপনি নামায পড়ছেন অথচ আপনার মাতা-পিতা নামায পড়ছেন না। তখনই আপনার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবাধ্যতা পাওয়া যাওয়া খুবই সহজ।

৭. মাতা-পিতার মধ্যে কোন অপরাধ অবলোকন করে আপনি তাদের অবাধ্য হলেন। যেমন: আপনার মাতা-পিতা খুব কঠিন মেজাজের, অত্যন্ত কৃপণ, গোঁয়ার বা একগুঁয়ে। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, শির্ক চাইতে আর বড় অপরাধ দুনিয়াতে নেই। যখন আপনার মাতা-পিতা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আপনাকে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করতে বললেও আল্লাহ্ তা'আলা আপনার মাতা-পিতার সাথে দুনিয়াতে ভালো ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন তখন এ ছাড়া অন্য কোন অপরাধের কারণে তাদের অবাধ্য হওয়া মারাত্মক অপরাধই বটে।

৮. দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে আপনি তাদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে তর্ক ধরলেন। যেমনিভাবে আপনি তর্ক ধরে থাকেন আপনার সাথী-সঙ্গীদের সাথে। কারণ, আপনি তাদের সঙ্গে কোন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে আদিষ্ট নন। বরং আপনি সর্বদা তাদের সঙ্গে নম্রতা দেখাতে একান্তভাবে বাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

»وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَـهُمَا أُفٍّ، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وَقُلْ لَـهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا، وَاخْفِضْ لَـهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا«

''আপনার প্রভু এ বলে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়জন তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদেরকে বিরক্তি সূচক কোন শব্দ বলবেনা এবং তাদেরকে ভৎর্সনাও করবেনা। বরং তাদের সাথেসম্মান সূচক নম্র কথা বলবে। দয়াপরবশ হয়ে তাদের প্রতি সর্বদা বিনয়ী থাকবে এবং সর্বদা তাদের জন্য এ দো'আ করবে যে, হে আমার প্রভু! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন যেমনিভাবে শৈশবে তারা আমার প্রতি অশেষ দয়া করে আমাকে লালন-পালন করেছেন''। (ইস্রা/বানী ইসরাঈল্ : ২৩-২৪)

তবে তারা আপনাকে কোন গুনাহ্'র আদেশ করলে আপনি তাদেরকে কুর'আন ও হাদীসের বাণী শুনিয়ে সে আদেশ থেকে বিরত রাখবেন।

৯. মাতা-পিতার পারস্পরিক ঝগড়া দেখে আপনি তাদের যে কারোর পক্ষ নিয়ে অন্যজনকে কোন অপবাদ, কটু কথা বা বিরক্তি সূচক শব্দ বললেন। এমনকি তার

অবাধ্য হলেন। যেমন: আপনি আপনার মাতা-পিতার মধ্যে কোন ঝগড়া হতে দেখলেন এবং আপনি বুঝতেও পারলেন যে, আপনার পিতা এ ব্যাপারে সত্যিকারই দোষী। সুতরাং আপনি এ পরিবেশে আপনার পিতাকে কোন গাল-মন্দ করতে পারেননা এবং তার সাথে কোন কঠোরতাও দেখাতে পারেননা। যাতে আপনি তার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন। বরং আপনার কাজ হবে, সূক্ষ্মভাবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। তবে খেয়াল রাখবেন, মীমাংসা করতে গিয়ে আপনার পিতাকে আপনি কোন বিশ্রী শব্দ বলবেন না। যাতে তিনি আপনাকে আপনার মায়ের পক্ষপাতী বলে মনে না করেন। বরং আপনি আপনার পিতার প্রতি ভালোবাসা দেখাবেন এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এরপরও আপনার পিতা হঠকারিতা দেখালে আপনি তাকে কটু বাক্য শুনাতে পারেন না এবং তার প্রতি কঠোরও হতে পারেন না।

১০. আপনি বিবাহ করার পর আপনার মাতা-পিতা থেকে ভিন্ন হয়ে গেলেন। আপনি মনে করছেন, আপনার মাতা-পিতার সঙ্গে আপনার মানসিকতার কোন মিল নেই। সুতরাং দূরে থাকাই ভালো অথবা আপনার স্ত্রী আপনাকে ভিন্ন হতে বাধ্য করেছে অথবা আপনি আপনার পরিবারের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চান অথবা আপনি মনে করছেন, ঘরে এমন লোক রয়েছে যারা তাদের খিদমতের জন্য যথেষ্ট অথবা আপনি একাকী ভালো খেতে ও ভালো পরতে চান। কারণ, আপনার এমন সঙ্গতি নেই যে, আপনি আপনার মাতা-পিতাকে নিয়ে ভালো খাবেন ও ভালো পরবেন।

আপনার ধারণাগুলো সঠিক কিনা সে বিষয়ে আলোচনা না করে আমি উক্ত ব্যাপারে আপনাকে একটি মৌলিক ধারণা দিতে চাই। তা হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে আপনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে:

ক. তাদের থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে তাদের অনুমতি চাইতে হবে। তারা আপনাকে ভিন্ন হওয়ার মৌখিক অনুমতি দিলেও আপনাকে এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা অনুমতিটুকু সুস্পষ্ট ভাষায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছেন কিনা? নাকি এমনিতেই দিচ্ছেন।

খ. তাদের খিদমতের জন্য পছন্দসই যথেষ্ট লোক থাকতে হবে। সুতরাং ঘরের মধ্যে যদি তাদের খিদমতের জন্য কোন লোক না থাকে অথবা তারা আপনার ও আপনার স্ত্রীর খিদমতের মুখাপেক্ষী হন তাহলে এমতাবস্থায় আপনার জন্য ভিন্ন হওয়া জায়িয হবে না। যদিও তারা আপনাকে এ ব্যাপারে মৌখিক অনুমতি দিয়ে থাকে। কারণ, সে অনুমতি কখনো সন্তুষ্ট চিত্তে হবে না।

গ. তাদেরকে সর্বদা প্রয়োজনীয় খরচাদি দিতে হবে। আপনি যেখানেই থাকুননা কেন।
১১. তারা আপনাকে কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন। অথচ আপনি এ ব্যাপারে তাদেরকে কোন উত্তরই দিচ্ছেন না। যেমন: আপনি কোন ব্যাপারে খুশি হয়েছেন অথবা নাখোশ। তখন এ ব্যাপারে আপনার মাতা-পিতা জানতে চাইলেন। অথচ আপনি কিছুই বলছেননা।
১২. আপনি কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিলেন। অতঃপর সেও আপনার মাতা-পিতাকে গালি দিয়েছে।
আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:
إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّه.ُ
"সর্ববৃহৎ অপরাধ হচ্ছে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্'র রাসূল! মানুষ কিভাবে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন: তা এভাবেই সম্ভব যে, সে কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিলো। অতঃপর সে ব্যক্তি এর মাতা-পিতাকে গালি দিলো"। (বুখারী ৫৯৭৩; মুসলিম ৯০)

মা-বাবার অসন্তুষ্টি সন্তানের জন্য কতটা ক্ষতি বয়ে আনে হাদিসের একটি ঘটনার মাধ্যমে তা সহজেই অনুমান করা যাবে।
এবিষয়ে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলাম পূর্ব যুগে জুরাইজ নামক জনৈক ইবাদতগুজার ব্যক্তি কোনো এক গির্জায় ইবাদত করত। একবার তার মা তার গির্জায় এসে তাকে ডাকতে শুরু করল। বলল, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো। তার মা তাকে নামাজ পড়তে দেখল।
তখন সে তাঁর ডাকে বলল, হে আল্লাহ! আমার মা এবং আমার নামাজ! এ কথা বলেই সে নামাজে রত থাকল। এভাবে তার মা তিন দিন তাকে ডাকল এবং সে প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে একই আচরণ দেখাল।
তৃতীয় দিন তার মা তাকে এই বলে বদদোয়া করল, হে আল্লাহ! আপনি আমার ছেলের মৃত্যু দেবেন না যতক্ষণ না সে কোনো দুশ্চরিত্রা নারীর চেহারা দেখে। আল্লাহ তাআলা তার মায়ের বদদোয়া কবুল করেন।

জনৈক মেষচারক তার গির্জায় রাত যাপন করত। একবার এক সুন্দরী নারী গ্রাম থেকে বের হয়ে এলে সে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর ওই নারী একটি ছেলে জন্ম দেয়। ওই নারীকে সন্তানের বাবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, সন্তানটি ইবাদতগুজার ব্যক্তির।

এ কথা শুনে সাধারণ জনগণ কুড়াল-শাবল নিয়ে গির্জায় উপস্থিত হয়। তারা গির্জায় এসে তাকে নামাজ পড়তে দেখে তার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি, বরং গির্জাটি ধ্বংস করার কাজে লেগে গেল। সে এই কাণ্ড দেখে গির্জা থেকে নেমে এলো। তখন তারা তাকে বলল, কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে এই নারীকে জিজ্ঞেস করো।

ইবাদতগুজার ব্যক্তি মুচকি হেসে বাচ্চার মাথায় হাত রেখে বলল, তোমার বাবা কে? বাচ্চাটি বলল, মেষচারক। জনগণ তা শুনে তাকে বলল, আমরা তোমার ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জা সোনা-রুপা দিয়ে বানিয়ে দেব। সে বলল, তা করতে হবে না, বরং তোমরা মাটি দিয়েই বানিয়ে দাও যেভাবে আগে ছিল। -(মুসলিম, হাদিস : ২৫৫০)

মা'র নাফরমানীর শিক্ষণীয় শাস্তি:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা শুনলে মুখ দিয়ে কলিজা বের হয়ে আসে। কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন যুবকের মুমূর্ষ অবস্থা। লোকজন তাকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার উপদেশ দিচ্ছে। অথচ তার মুখই খুলছে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কি নামায পড়তো? সে বললো, জ্বী হাঁ। নামায পড়তো। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন এবং তার সাথে চললেন। আমরাও পিছু পিছু চললাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে যুবকের নিকট পৌঁছলেন। তখন মৃত্যু পূর্ববর্তী অবস্থা। তিনি তাকে কালেমা পড়ার তালকিন দিলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিতো বলতে পারি না। তিনি বললেন, কেন? কি ঘটনা? জানা গেলো সে মাতার নাফরমানী করে থাকে। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তার মা কি জীবিত আছেন? সবাই বললো, জ্বী হাঁ। জীবিত আছেন। প্রিয় নবী তার মা'কে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। যখন তার বৃদ্ধা মাতা এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, বড় বিবি! একি তোমার পুত্র? সে বললো, জ্বী হাঁ, আমারই পুত্র। তিনি বললেন, বড় বিবি। এটা

বলো, যদি এক ভয়ংকর আগুন প্রজ্জ্বলন করা হয় এবং তোমাকে বলা হয় যে যদি সুপারিশ করো তাহলে সে পরিত্রাণ পায়। নচেৎ তাতে সে নিক্ষিপ্ত হয়। এ অবস্থায় কি তুমি সুপারিশ করবে? বৃদ্ধা বললো, জ্বী হাঁ। সে সময় তো আমি অবশ্যই সুপারিশ করবো। একথা শুনে রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি আল্লাহ ও আমাকে সাক্ষী রেখে বলো যে, তুমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছো।

বৃদ্ধা বললেন, হে আল্লাহ ! আমি তোমাকে এবং তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার কলিজার টুকরার প্রতি রাজী হয়ে গেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে যুবকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, বলো, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।” মাতার সন্তুষ্টির বরকতে যুবকের মুখ খুলে গেলো এবং সে তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়লো। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমার অসিলায় এ নওজোয়ানকে জাহান্নামের ভয়ংকর আযাব থেকে নাজাত দিয়েছেন।- তিবরানী, আহমদ

তাই সকল ক্ষেত্রে পিতামাতার প্রতি সদয় হতে হবে এবং তাদের সাথে অবাধ্যতা দূরের কথা তাদের সামনে জোড় গলায় কথাও বলা যাবেনা।

পিতা মাতার ইন্তেকালের পর করণীয়

“হযরত আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জি জ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল! মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জ্বী হাঁ। চারটি সুরত রয়েছে-(১) মাতা-পিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার, (২) তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পূরণ, (৩) পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের ইজ্জত ও খাতিরদারী ও (৪) তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা, যারা মাতা- পিতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন।"-আল আদাবুল মাফরুজ

মাতা-পিতা শিশু লালন-পালন এবং প্রশিক্ষণের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন এবং দিবা-রাত্রি তত্ত্বাবধান করেন। আসল কথা হলো: আপনি যদি জীবনভরও দাস-দাসীর মতো তাঁদের খিদমত করতে থাকেন, তবুও তাঁদের খিদমতের হক আদায় হতে পারে না। এ কারণেই একজন মুমিন সারা জীবন মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করে থাকে। কিন্তু যখন মাতা-পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখনো চিন্তা করতে থাকেন যে, হায় আমি তো কিছুই করতে পারিনি। আর এজন্যেই তিনি তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের রূহকে খুশী করার জন্য কোনো পন্থা কামনা করেন। এ ধরনের মুমিনের প্রাণের আবেগ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন করেছিলেন জনৈক ব্যক্তি। তিনি জবাবে বলেছিলেন, ওফাতের পরও তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা যায় এবং এ আচরণের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করে দপন।

এক: দোয়া ও ইসতিগফার: নামাযের পর এবং অন্য সময় আল্লাহর

নিকট কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন যে, হে আল্লাহ! আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা করুন। তাঁদের গুনাহসমূহকে ঢেকে দিন এবং তাঁদেরকে আপনি তাই দান করুন যা আপনি নেক বান্দাহ-বান্দীকে দিয়ে থাকেন। হে আল্লাহ ! যখন আমরা তাঁদের সাহায্য, স্নেহ ও লালন-পালনের মুখাপেক্ষী ছিলাম তখন তারা সবকিছু আমাদের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। দিনে আয়েশ এবং রাতের আরাম আমাদের জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন। পরওয়াদিগার!

এখন তাঁরা তোমার নিকট সমুপস্থিত। শৈশবকালে অসহায় অবস্থায় আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলাম। এখন তাঁরা সেই সময়ের চেয়ে বেশী তোমার রহমাত ও সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী। পরওয়ারদিগার! তুমি তাঁদেরকে নিজের রহমাতের ছায়া দান করো এবং নিজের সন্তুষ্টির ঘর জান্নাতে তাঁদের আশ্রয় দাও।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর পর যখন মাইয়েতের মর্যাদা বুলন্দ হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে এটা কেমন করে হলো? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুই বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যান তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। শুধু তিনটি বিষয় এমন যা তার মৃত্যুর পরও উপকার করতে থাকে। প্রথম, ছাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয়, তার বিস্তৃত সেই ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয়, সেই নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হযরত ইবনে শিরীন রাহমাতুল্লাহ আলাই একজন মশহুর বুজর্গ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি একটি কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এক রাতে আমরা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে পরওয়ারদিগার! আবু হুরাইরাকে ক্ষমা করো এবং হে পরওয়ারদিগার! আবু হুরাইরার মাতাকে ক্ষমা করো এবং হে পরওয়ারদিগার! তাদের সবাইকে ক্ষমা করো, যারা আবু হুরাইরাহ এবং তার মাতার ক্ষমার জন দোয়া করে। হযরত ইবনে শিরীন রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন, আমরা অ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মাতার পক্ষে ক্ষমার দোয়া করতে থাবি যাতে আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়ায় শামিল থাকি।

দুই: মাতা-পিতার ওয়াদা ও ওসিয়ত পূরণ করা:

মাতা-পিতা জীবিত অবস্থায় অনেক লোকের সাথে ওয়াদা করে থাকতে পারেন। বিভিন্ন ব্যাপারে কিছু ওয়াদা করতে পারেন। মৃত্যুর সময় কিছু ওসিয়ত করতে পারেন। মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর সন্তানের জন্য তাঁদের সাথে সুন্দর বা নেক আচরণের একটি পন্থা অবশিষ্ট থাকে। তাহলো তাঁদের কৃত ওয়াদাসমূহ ও ওসিয়ত পূরণ করা। আর এভাবেই তাঁদের রূহকে খুশী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু তাঁদের জায়েয বা বৈধ ওসিয়তই পূরণ করতে হবে। যদি তাঁদের অবৈধ ওসিয়তও পূরণ করা হয় তাহলে এটা তাঁদের সাথে নেক আচরণ হবে না বরং খারাপ আচরণ হবে।
মাতা-পিতা যদি কারোর সাথে আর্থিক সাহায্য দানের ওয়াদা করে থাকেন অথবা কাউকে কিছু দান করতে চেয়ে থাকেন। আর জীবনে যদি তার সুযোগ না পান অথবা তাঁরা কোনো মানত করেছিলেন, কিন্তু তা পূরণের আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। অথবা তিনি ঋণী ছিলেন অথবা ওসিয়াত করার সুযোগ পাননি, অথচ আপনি বুঝেন যে, সুযোগ পেলে তিনি অবশ্যই এ ওসিয়াত করতেন অথবা তিনি কোনো ওসিয়ত করেননি। আপনি যদি তাঁদের পক্ষ থেকে সাদকাহ করেন তাহলে এসবই তাঁদের সাথে নেক আচরণ হবে। আর এভাবেই তাঁদের ওফাতের পরও আপনি জীবনভর তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোনো ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু সাদকাহ করি তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন নয়।

এ হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুই বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা মানত মেনেছিলেন। কিন্তু এ মানত আদায়ের পূর্বেই তিনি ওফাত পেয়েছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মানত পুরো করতে পারি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, কেন নয়। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।

তিন : মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে আচরণ :
মাতা-পিতার ওফাতের পর তাঁদের সাথে আচরণের তৃতীয় পন্থা হলো, মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে নেক বা সুন্দর আচরণ করা। সামাজিক জীবনে বুজর্গ ব্যক্তিদের মতো তাঁদেরকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন প্রশ্নে পরামর্শের সময় তাঁদেরকে শরীক করা এবং সবসময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আবশ্যক।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আমল:
একবার হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। এমনকি জীবিত থাকার আর আশা রইলো না। এ সময় হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে তাঁর সেবার জন্য উপস্থিত হলেন। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কি করে এলে? ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হযরত ! শুধু আপনার সেবার জন্যই আমি এখানে হাজির হয়েছি। কেননা শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আপনার মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সফরে ছিলেন। এ সময় মক্কার এক বুদ্দুর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। বুদ্দু হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুব ভালোভাবে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি হযরত ওমরের পুত্র? হযরত ইবনে ওমর জবাব দিলেন, জ্বী হাঁ। আমি তাঁরই পুত্র। এ সময় তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তাঁকে দিলেন এবং নিজের গাধার উপর সম্মানের সাথে বসালেন। হযরত ইবনে দিনার বললেন, আমরা সবাই বিস্ময়ের সাথে এসব দেখতে লাগলাম এবং পরে বললাম, হে হযরত ! সে তো একজন বুদ্দু অথবা গ্রামবাসী।

আপনি যদি দু দেরহাম দিয়ে দিতেন তাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ভাই তাঁর পিতা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পিতা বন্ধুদেরকে সম্মান করো ও এ সম্পর্ক নিঃশেষ হতে দিও না। নচেত আল্লাহ তাআলা তোমাদের আলো নির্বাপিত করে দেবেন।

হযরত আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি যখন মদীনায় এলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আবু বুরদাহ ! তোমার নিকট কেন এসেছি তা কি তুমি জান? আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হযরত! আমি তো তা জানি না। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত নিজের পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে চায় তার উচিত পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বললেন, ভাই! আমার পিতা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আপনার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর হক আদায় করতে চাই। -ইবনে হাব্বান

চার : মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ : মাতা- পিতার ওফাতের পর আচরণের চতুর্থ পন্থা হলো, মাতা-পিতার আত্মীয়- স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ করা। মাতামহের পক্ষের আত্মীয় যেমন খালা, মামু, নানী, নানা প্রভৃতি এবং পিতামহের পক্ষের আত্মীয় যেমন চাচা, ফুফু, দাদা-দাদী ইত্যাদি। এ সকল আত্মীয় থেকে মুখাপেক্ষীহীনতা থাকা এবং বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে মাতা-পিতার প্রতি মুখাপেক্ষীহীন থাকার নামান্তর এবং একজন মুমিন ও মুমিনা মাতা-পিতার সাথে বেপরোয়ামূলক আচরণ করতে পারে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাদ হলো, তোমরা তোমাদের পিতা ও পিতামহের সাথে কখনও বেপরোয়ামূলক আচরণ করবে না। মাতা-পিতার সাথে বেপরোয়ামূলক আচরণ করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার শামিল।

মাতা-পিতার ঋণের চিন্তাঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি মাতা-পিতার খিদমত এবং অধিকারের প্রতি অংজ্ঞা করেননি। জীবিতাবস্থায় যেমন খেয়াল রাখতেন তেমনি মৃত্যুর পরও তিনি মাতা-পিতার অধিকারের প্রতি পুরোপুরিই দৃষ্টি রেখেছিলেন। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণত যখন কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তখন মৃত্যুর পর পরই তার উত্তরাধিকাররা নিজেদের অংশের চিন্তায় পড়ে যায়। কিন্তু সাধারণ দুনিয়াদারদের মতো তিনি নিজের অংশের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তাগ্রস্ত হননি। অথচ মিরাছ সূত্রে তাঁর প্রাপ্য ছিলো কোটি কোটি পরিমাণের। অবশ্য তাঁর চিন্তা একটিই ছিলো যে, পিতা কারোর নিকট ঋণগ্রস্ত রয়ে যাননি তো? বস্তুত তিনি সর্বপ্রথম রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে পিতার ঋণ পরিশোধ করেন। ঋণ পরিশোধের পর অন্যান্য উত্তরাধিকাররা মিরাছ বণ্টনের তাগাদা প্রদান এবং দাবী উত্থাপন শুরু করলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ মিরাছ বণ্টনে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, চার বছর অব্যাহতভাবে হজ্জের মওসুমে পিতার ঋণের ব্যাপারে তিনি ঘোষণা দিতে থাকবেন। যদি কোনো পাওনাদার থাকে তাহলে সে তা আদায় করে দেবে। কোনো পাওনাদার থাকতেও তো পারে! চার বছর এভাবে ঘোষণা দানের পর তিনি মিরাছ বণ্টন করবেন।

এভাবে তিনি অন্যান্যদেরকে মিরাছ বণ্টনে চার বছর বিলম্ব করার প্রশ্নে সম্মত করিয়ে নিলেন এবং হজ্জের মওসুমে ঘোষণা দিয়ে পিতার জন্য হাজার হাজার মানুষ দিয়ে দোয়া ও মাগফিরাত করিয়ে নিতে থাকেন।

মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার সওয়াবঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُولَهُمَا وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًا-

“হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি আজীবন মাতা-পিতার নাফরমানী করে এবং তার মাতা-পিতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তেকাল করেন তাহলে তার

উচিত অব্যাহতভাবে মাতা-পিতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। ফলে আল্লাহ নিজের রহমাতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে লিখে দেন।"

আজীবন মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। কিন্তু সামগ্রিক প্রচেষ্টার পরও যদি তাঁরা সন্তুষ্ট না হন এবং অসন্তুষ্ট অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তাহলেও আল্লাহর রহমাতের দরজা খোলা থাকে ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব। অব্যাহতভাবে তাঁদের জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ পাক ভুল ক্ষমা করে দিতে পারেন বলে আশা করা যায় ও আপনাকে উত্তম বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত করতে পারেন। আল্লাহর রহমত থেকে কোনো মুমিন বান্দারই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বান্দাহর অন্তরে যখনই তাওবার আবেগ সৃষ্টি হয় তখনই তিনি অগ্রসর হয়ে তা কবুল করে নেন এবং সেই আবেগকে অগ্রসর করানো ও জীবনের উপর তার প্রভাব ফেলার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন কিন্তু এ হাদীস থেকে ভুল ধারণা নেয়া অবশ্যই ঠিক নয় যে, মাতা-পিতা জীতি থাকা অবস্থায় অবাধ্য থেকে তাঁদের মৃত্যুর পর দোয়া এবং ইসতিগফার করে আল্লাহর রহমাত লাভ করা যাবে। সঠিক কথা হলো, জীবিতাবস্থায় তাঁদের খিদমত এবং সন্তুষ্ট রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করা।

অমুসলিম মাতা-পিতার সাথে আচরণ

এ দুনিয়ায় অবিরাম গতিতে হক ও বাতিলের এবং ন্যায়-অন্যায়ের সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। কম হলেও এটা সম্ভব যে, কোনো মুসলমানের মাতা-পিতা ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। এ অবস্থায় তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা যাবে? এটা সামজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

দীন এবং ঈমানের প্রশ্নে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতা যদি শিরক ও গুনাহর নির্দেশ দেন তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না। আল্লাহর হক মাতা-পিতার চেয়ে বেশী এবং মাতা- পিতারও উচিত আল্লাহর হক আদায় এবং

তার আনুগত্য করা। কেননা তাদের স্রষ্টা ও মালিকের নাফরমানী করে মাতা-পিতার আনুগত্য করা তো দূরে থাকুক এ ধরনের চিন্তা করাও জায়েয নয়।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا - - لقمن١٥ :

"যদি মাতা-পিতা তোমাদের উপর আমার সাথে কাউকে অংশীদার বানানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করে-যে সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই-তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না।"-সূরা লুকমানঃ ১৫ শুধুমাত্র শিরকের ব্যাপারেই নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর নাফরমানী আবশ্যিক হয়ে উঠে সেসব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য নিঃশেষ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর নাফরমানী করে কারোর আনুগত্য করা যাবে না।

হযরত সা'দের কাফের মা

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে ওয়াক্কাস একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর মা এ খবর পেলো। খবর পেয়েই কসম খেয়ে বসলো। হয় ইসলাম ছাড় না হয় অভুক্ত থেকে জীবন দিয়ে দিবো। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু মা'র অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। মা তাঁকে বার বার বলতে লাগলো, দেখো! তোমাদের দীনে তো মাতা-পিতার আনুগত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমি তোমার মা। মা'র কথা অমান্য করে তুমি স্বয় নিজের দীনের খেলাফ করছো। আমি তোমাকে ইসলাম পরিত্যাগে নির্দেশ দিচ্ছি। হযরত সা'দ নিজে বর্ণনা করেছেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তিনি কিছু খাননি এবং পানও করেননি। ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে বেশ হয়ে যান। আমার ভাই জোর-জবরদস্তি করে তার মুখে ধরে হা করিয়ে খাওয়ান। এ অবস্থায় আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন:

"মাতা-পিতা যদি তোমাদেরকে শিরকের ব্যাপারে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা মেনো না।"

দীন ও ঈমান প্রশ্নে ব্যাপারটি তো স্পষ্ট। সিদ্ধান্তমূলকভাবে তাদের আনুগত্য অস্বীকার করতে হবে এবং তাদের কঠোরতা ও চাপে মোটেই প্রভাবিত হওয়া যাবে না। কিন্তু

পার্থিব ক্ষেত্রে তাদের খিদমত এবং সুন্দর আচরণ করতে হবে। নরম আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে ঈমানের দিকে আনয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا : وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَابَ إِلَى : - لقمن١٥ :

“এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে থাকো এবং আনুগত্য তাদের করো যারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"-সূরা লুকমান: ১৫

ইসলাম মাতা-পিতার খিদমত ও আনুগত্যের চরম গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি মাতা-পিতা যদি কুফর ও শিরকের পংকিলতায় নিমজ্জিত থাকে। শুধু নিজেই নয় বরং সন্তানদেরকেও তাতে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য বাধ্য করতে চায় তবুও সন্তানের জন্য প্রয়োজন হলো পার্থিব বিষয়াদিতে তার মর্যাদা কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা যাবে না। যাই হোক, তাঁরা মাতা- পিতা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যম। এজন্য সকল কিছু সত্ত্বেও সব ধরনের খিদমত এবং সুন্দর আচরণ তাঁদের সাথে করা ফরয। প্রয়োজন হলে তাঁদেরকে আর্থিক সাহায্যও দিতে হবে এবং পার্থিব দিক থেকে কোনো অভিযোগের সুযোগ তাঁদেরকে দেয়া যাবে না। অবশ্য দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, ইসলামের পথে রয়েছেন এবং আল্লাহর সত্যিকার অনুগত নেক্কার বান্দাদেরকেই অনুসরণ করতে হবে।

মুশরিক মা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَض قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

وَسَلَّمَ قُلْتُ : قَدِمَتْ عَلَى أُمِّى ، وَهِيَ رَاغِبَةً أَفَاصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمُ صلى أُمَّكَ - بخارى

“হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুহিতা হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে আমার মাতা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এসেছিলেন। আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

নিকট আরজ করলাম, আমার মা এসেছেন। অথচ তিনি ইসলামের উপর বেজার। আমি কি তার সাথে আত্মীয়তাজনিত ব্যবহার করতে পারি? তিনি বললেন, হাঁ। নিজের মা'র সাথে আত্মীয়তাজনতি ব্যবহার করতে পারো।"-বুখারী

এ হাদীসটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মুশরিক মাতা-পিতার সাথেও তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যেমন মুসলিম মাতা-পিতার সাথে রাখতে হয়। পার্থিব বিষয়াদিতে তাঁদের মান-সম্মান ও খিদমতের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সকলভাবে তাঁদের আরাম দিতে হবে। কিন্তু একজন মুমিন হিসেবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, মাতা- পিতার প্রতি সবচেয়ে বড়ো শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং সুন্দর আচরণ হলো নিজের চরিত্র, আচরণ, আলাপ-আলোচনা এবং খিদমতের মাধ্যমে তাঁদেরকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো। তাঁদের হেদায়াতের জন্য মন খুলে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট দোয়া করা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আম্মাও প্রথমে ইসলাম থেকে মাহরুম ছিলেন। কিন্তু তিনি তার মান-সম্মান প্রদর্শন এবং খিদমতে মাহরুম ছিলেন। কিন্তু তিনি তার মান-সম্মান প্রদর্শন এবং খিদমতে কোনো কমতি করেননি। সবসময় তাঁর সাথে সুন্দর আচরণ করতে থাকেন এবং ইসলামের দাওয়াতও দিতে থাকেন। সবসময় আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকেন যে, তিনি যেন হেদায়াত প্রাপ্তা হন। তার এ ঘটনায় স্পষ্টভাবে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ না করুন কারো মাতা- পিতা যদি অমুসলিম হন, তাহলে তাঁদের সাথে কিভাবে থাকবেন, কিভাবে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যাবে, কিভাবে তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার ও তাঁদের শুভ কামনা কিভাবে পূরণ করা যাবে।

ইসলাম অস্বীকারকারী মা'র সাথে সুন্দর আচরণের ফল

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হবার পর দীর্ঘদিন যাবত তাঁর আম্মা শিরকে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি অব্যাহতভাবে তাঁকে শিরকের পরিণাম এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু যেহেতু তখন পর্যন্ত তাঁর অন্তর হিদায়াত গ্রহণের জন্য খোলেনি, এজন্য তিনি অস্বীকৃতিও অব্যাহত রেখেছিলেন। এ সত্ত্বেও হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ইজ্জত, খিদমত ও আনুগত্যে কমতি করেননি। একদিন যখন তিনি দীনের দাওয়াত পেশ করছিলেন তখন তাঁর আম্মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অন্যায় আচরণ করলো। এতে হযরত আবু

হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তর বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সবসময় আমার আম্মাকে দীনের কথা বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু সে সবসময়ই তা অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু আজ তো গজবই হয়ে গেছে। আজ আমি যখন তার সামনে দীনে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছিলাম তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে আপনার শানে বেয়াদবিই করে বসেন এবং আপনাকে গালমন্দ দিয়ে ফেলেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা সহ্য করতে পারিনি। আমার অন্তর বেদনা বিধূর হয়ে এলো এবং আমার চা দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ যে আমার আম্মার অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেন।" রহমতে আলম আমার আম্মার অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেন।" রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাত দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! আবু হুরাইরারর আম্মাকে হেদায়াত দিন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দোয়া করতে দেখে আমার সকল দুশ্চিন্তা দূর হতে থাকলো এবং আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলাম। বাড়ী পৌঁছে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ এবং পানি পড়ার শব্দ আসছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে শ্রদ্ধেয় আম্মা বললেন, পুত্র! বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। বাইরেই আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। পানি পড়ার শব্দ শুনেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে, আম্মাজান গোসল করছেন। আমার অন্তর তখন আনন্দে আত্মহারা ! আম্মাজান তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে কাপড় পরে এসে দরজা খুলে দিলেন। তিনি এতো তাড়াতাড়ি করেছিলেন যে, দোপাট্টা ব্যবহার করতেও ভুলে গিয়েছিলেন এবং দরজা খুলেই বললেন, পুত্র আবু হুরাইরা! আল্লাহ তোমার কথা শুনেছেন। তুমি সাক্ষী থেকো। আমি কালেমা পড়ছি। "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" আমি এতো আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আনন্দে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিলো। চোখে আনন্দাশ্রু সমেত সেই সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার আম্মা ঈমানের সম্পদ লাভ করেছেন। একথা শুনে তিনিও খুব

খুশী হলেন। আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করলেন এবং আমাকে কয়েকটি নসিহত করলেন।

অতপর আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরো একটি বিষয় নিবেদন করলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে এবং আমার আম্মাকে সকল মুমিনের প্রিয় বানিয়ে দেন এবং সকল মুমিন আমার ও আমার আম্মার প্রিয় হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দোয়াও করলেন। পরওয়ারদিগার! তুমি আবু হুরাইরা ও তার আম্মার প্রতি ভালোবাসা সকল মুমিনের অন্তরে দাও এবং তাদের উভয়ের অন্তরে সকল মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করো।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

সুসন্তানের জন্য প্রস্তুতি

সন্তান বাবা-মার ভবিষ্যৎ বংশধর। তারা বাবা-মার উত্তরাধিকারী। তবে সন্তান শুধু সম্পদেরই উত্তরাধিকারী নয়; বরং বংশের উত্তরাধিকারী এবং বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী। এমনকি তারা বাবা-মার আদর্শ, অভ্যাস, আচার-আচরণ ও স্বপ্নের উত্তরাধিকারী।

প্রত্যেক দ্বীনদার বাবা-মা-ই এমন সন্তান চায়, যে সন্তান জীবন ও মরণে হবে মা-বাবার জন্য উপকারী। যে সন্তান হবে বাবা মার চক্ষু শীতলকারী এবং মুখ উজ্জ্বলকারী। যে সন্তান সমাজ ও জাতিকে সত্য, সুন্দর ও আলোর পথ দেখাবে। যে সন্তান হবে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী। কুরআন মাজিদে এমনই এক সুসন্তান প্রত্যাশী লুকমান হাকিমের ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يُبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ فِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾١٣﴿ ُ

"স্মরণ করুন, যখন লুকমান তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন-ও প্রিয় ছেলে! আল্লাহর সাথে কখনোই শিরক করবে না। কারণ, শিরক তো বিরাট জুলুম। আমি মানুষকে অসিয়ত (নির্দেশ) করেছি বাবা মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করতে।

কারণ, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং, শোকরগুজার হও আমার প্রতি আর তোমার বাবা-মার প্রতি। আর তোমাদের তো ফিরে আসতে হবে আমারই কাছে।" সূরা লুকমান: ১৩-১৪

প্রত্যেক দ্বীনদার বাবা-মাই লুকমান হাকিমের সন্তানের মতো এমন সন্তান চান, যে সন্তান গোপনে ও প্রকাশ্যে হবে আল্লাহর ভয়ে ভীত, সালাত কায়েমকারী, ভালো কাজের নির্দেশক, মন্দ কাজের প্রতিবাদী, বিপদে অবিচল, মানবদরদী, নিরহংকার, কোমলভাষী, আল্লাহওয়ালা, মিল্লাতে ইবরাহিমের ঝান্ডাবাহী এবং একই সাথে জীবনে সাফল্য অর্জনকারী। লুকমান আ. সন্তানের কাছে এ সকল গুণাবলি প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলছিলেন-

يُبْنَى أَقِمِ الصَّلوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۷﴾ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۱۸﴾ وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْت الْحَمِير ِ (19

"হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম করবে, মানুষকে ভালো কাজের আদেশ ও উৎসাহ দেবে, মন্দ কাজ হতে নিষেধ ও নিরুৎসাহিত করবে। আর বিপদ-মুসিবত এলে সবর করবে; অবশ্য সবর করতে পারাটা ভীষণ মজবুত সংকল্পের কাজ। দম্ভ করে মানুষকে অবজ্ঞা করবে না। জমিনে ঔদ্ধত্যের সাথে চলাফেরা করবে না। কারণ, আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং কণ্ঠস্বর রাখবে সংযত। নিশ্চয় সবচেয়ে অস্বস্তিকর আওয়াজ হলো গাধার ধ্বনি।" সূরা লুকমান : ১৭-১৯

সর্বোপরি বাবা মায়ের প্রত্যাশা থাকে এমন সন্তান, যে সন্তান দিনের আলোতে হবে কর্মবীর আর রাতের আঁধারে হবে প্রভুর সমীপে অশ্রুসজল।

তবে কেবল প্রত্যাশা করলেই ফল পাওয়া যায় না, ভালো ফল পাওয়ার জন্য ভালো বীজ বপন করতে হবে। ভালো বীজ হতে অঙ্কুরিত হবে সম্ভাবনাময় চারা। সে চারার

সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিচর্যা। তবেই তো ভালো ফল লাভ করা সম্ভব হবে।

অতএব, সর্বোত্তম সন্তান পেতে হলেও বাবা-মাকে আদর্শ কৃষকের মতো তাকে অঙ্কুর হতেই সর্বোত্তম নার্সিং করতে হবে। প্রথমেই সর্বোত্তম সন্তান লাভের প্রত্যাশাকে মজবুত সংকল্পে পরিণত করতে হবে এবং একে বাস্তবে প্রতিফলিত করার জন্য গ্রহণ করতে হবে পূর্ব পরিকল্পনা।

ক. বিয়ে করবেন কাকে

সুসন্তানের প্রত্যাশায় পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হবে উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বাছাই। ভালো বীজ হতে যেমন ভালো ফল পাওয়া যায়, তেমনি ভালো বাবা- মা হতে ভালো সন্তান পাওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এটাই সাধারণ নিয়ম, তবে এর ব্যতিক্রমও ক্ষেত্রবিশেষে হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই এবং তা সংখ্যায় স্বল্প।

প্রিয় নবি সা. বলেছেন—

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَةً فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيض. ٌ

“যখন তোমাদের কাছে এমন কাউকে বিয়ে করার প্রস্তাব আসবে, যার দ্বীন এবং আখলাক তোমরা পছন্দ হয়, তখন তাকে জুড়ি হিসেবে গ্রহণ করো। এমনটি না করে ভিন্ন রকম জুড়ি গ্রহণ করলে তোমরা (দাম্পত্যজীবনে) চরম ফিতনা ও মারাত্মক বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যাবে।” তিরমিযি : ১০৮৪

কাজেই পাত্র কিংবা পাত্রীর দ্বীনদারিতাকে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। সেইসাথে প্রাধান্য দিতে হবে চারিত্রিক সৌন্দর্যকে। আর অবশ্যই খোঁজ নিতে হবে ছেলের উপার্জন হালাল কি না। সংসারে হারাম উপার্জন থাকলে আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং নেক সন্তানের আশা করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

অনেক সময় দেখা যায়, ছেলে যতই দ্বীনদার হোক, তার উপার্জন কিছুটা কম শুনলে মেয়েপক্ষ ইতস্তত বোধ করেন। পিছু হটে যান। ছেলের উপার্জন কম, হ্যান্ডসাম কম, উচ্চতা কম অথবা নিজের আলাদা বাসা নেই ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে মেয়েপক্ষ অনেক সময় ছেলেকে বিভিন্নভাবে অপমানিত করে ও কষ্ট দেয়। আজকাল অধিকাংশ অভিভাবককেই ছেলের উপার্জনের দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। কিন্তু এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, হালাল উপার্জন কম হলেও তাতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ তায়ালা তাতেই বরকত প্রদান করেন। আর কনে বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও দ্বীনদারিতাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া উচিত। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاغْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"বিয়ে করার ক্ষেত্রে সাধারণত কনের চারটি বিষয় দেখা হয়ে থাকে : ১. ধনসম্পদ, ২. বংশমর্যাদা, ৩. রূপ-সৌন্দর্য ও ৪. দ্বীনদারিতা। তবে তুমি দ্বীনদার মেয়েকে বিয়ে করে সফল হও; অন্যথায় তুমি লাঞ্ছিত হবে।" বুখারি : ৪৭২৩

বিয়ের ক্ষেত্রে খোঁজখবর নেওয়াটা ইসলামেরই নির্দেশনা। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, খোঁজখবর নিতে গিয়ে এমন কোনো আচরণ যেন করা না হয়, যা অপর পক্ষের জন্য মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ন করে। কোনো পক্ষই যেন কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। আর পাত্রী দেখতে হবে তখনই, যখন অপরাপর সবকিছু মনমতো হয়ে গেছে, এখন শুধু মেয়ে পছন্দ হলেই বিয়ে হবে। তবে এর আগে ছবি দেখা যেতে পারে। প্রয়োজনে ছেলের পরিবারের মহিলারা মেয়েকে দেখতে পারে। সব খোঁজখবর নেওয়ার পর বিয়ের বিষয় নিশ্চিত হয়ে গেলে, তখন ছেলে ও মেয়ে উভয়ে উভয়কে দেখতে পারে। সে সময় এ দেখাদেখির বিশেষ উদ্দেশ্য হলো-বিয়ের ব্যাপারে পারস্পরিক আগ্রহ, মায়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া।

ইসলাম পছন্দনীয় মেয়েকে বা ছেলেকে বিয়ে করতে উৎসাহিত করে; অর্থাৎ যার দিকে মন টানে। কুরআনে বলা হয়েছে—

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاء...

“তোমরা বিয়ে করো সেই মেয়েদের, যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে।” সূরা নিসা : ৩

হাদিস শরিফেও বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনে দেখার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে-

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

“মুগিরা ইবনে শুবা রা. হতে বর্ণিত, তিনি এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল সা. তা জেনে বললেন-'তুমি তাকে দেখে নাও। তা তোমাদের উভয়ের প্রণয়ে সহায়ক হবে।" তিরমিযি: ১০৮৭

ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে, মেয়েও ছেলেকে দেখে নেবে। উমর রা. বলেন- বিয়ের আগে পুরুষের যেমন নারীর কিছু বিষয় দেখে নেওয়ার রয়েছে, তেমনি নারীরও অধিকার রয়েছে তার সঙ্গীকে দেখে বেছে নেওয়ার।

মেয়ে দেখার ব্যাপারটা অনানুষ্ঠানিক ও অনাড়ম্বরভাবে হওয়া উচিত। আর মেয়ের করণীয় হচ্ছে, তিনি নিজেকে শালীনভাবে উপস্থাপন করবেন। আর ছেলেপক্ষের যা করণীয় তা হলো-মেয়েটার সম্মান যেন ক্ষুণ্ন না হয়, সেভাবেই তাকে দেখা। ছেলের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে মেয়েটা যেন ভাবতে পারে, তাকে জীবনসঙ্গীর দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে; চোখের লালসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে নয়। আরেকটা কথা মনে রাখা খুবই জরুরি, বাহ্যিক সৌন্দর্য কিন্তু সৌন্দর্যের একটি অংশ বটে, তবে সেটাই সকল সৌন্দর্য নয়। মেয়ে বা ছেলে দেখতে যেমনই হোক, বাহ্যিক সৌন্দর্যহীনতার কারণে কেউ বিয়ের অযোগ্য হয়ে যায় না। তার আখলাক ও অন্যান্য গুণাবলিরও রয়েছে সৌন্দর্যগত মর্যাদা। এমনকি আল্লাহ তায়ালার কাছে বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে দ্বীনদারিতার মূল্য অনেক বেশি।

কারও বাহ্যিক সৌন্দর্য ও আখলাকি সৌন্দর্য উভয়টি থাকলে, সেটি তো অনন্য। তবে বাহ্যিক ও আখলাকি সৌন্দর্যকে তুলনা করা হলে দ্বিতীয়টিই প্রাধান্য পাবে। মনে রাখতে হবে, মূলত দ্বীনতারিতাই মুখ্য বিষয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন-

“কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলে সর্বপ্রথম তার সৌন্দর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। যদি এ ব্যাপারে তার প্রশংসা করা হয়, তাহলে তার দ্বীনদারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রশংসিত হলে তাকে বিয়ে করবে; অন্যথায় দ্বীনের কারণে প্রত্যাখ্যান করবে।”

প্রথমেই মেয়ের দ্বীনদারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে না করা হয়েছে এজন্য যে, যেন প্রত্যাখ্যানটা সৌন্দর্যের কারণে না হয়; বরং দ্বীনদারিতার ওপর ভিত্তি করেই হয়। কারণ, দ্বীনদারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর যদি মেয়ের সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশংসনীয় কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হতে পারে। আর এই প্রত্যাখ্যানটা তখন হবে সৌন্দর্যের কারণে; দ্বীনদারিতার কারণে নয়। আর এটি একজন দ্বীনদার মেয়ের মর্যাদার পরিপন্থি।
বিয়ের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, দুই পক্ষকেই কিছু কিছু ছাড় দিতে হয়। কারণ, পৃথিবীতে কেউ শতভাগ নিখুঁত হয় না। পৃথিবীতে পারফেক্ট মানুষ বলতে কিছু নেই। আল্লাহ একেকজনকে একেক দিকে গুণ ও যোগ্যতা দান করেছেন; আবার আরেক দিকে দিয়েছেন কিছু ঘাটতিও। কেউ একেবারে অযোগ্য নয়; আবার কেউ একেবারে নিখুঁতও নয়। তাই বিয়েতে করণীয় হচ্ছে, উভয়পক্ষ অপর পক্ষকে বিভিন্ন বিষয়ে ছাড় দেওয়া এবং উদারতা প্রদর্শন করা। মৌলিকভাবে দ্বীনদারিতাকে মূল্যায়ন করে বাকিগুলোতে যথাসাধ্য ছাড় দেওয়া। সংকীর্ণতা ও খুঁতখুঁতে দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করা উচিত। কাজেই নেককার সন্তান চাইলে দ্বীনদারিতা ও আখলাকি সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

খ. সুসন্তানের জন্য প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ করা
সুসন্তান লাভের জন্য সব সময় দয়াময় আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে হবে। তাঁর কাছেই চাইতে হবে। নবি-রাসূলগণ আল্লাহর কাছে সুসন্তান চেয়েছিলেন। আর তাঁদের চাওয়াকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিবেচনা করে কুরআন মাজিদে তা উদ্ধৃত করেছেন।

সাইয়িদুনা ইবরাহিম আ. সুসন্তান চেয়ে দুআ করেন এভাবে-

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنُهُ بِغُلَمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبْنَى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرى قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ

“হে রব! আমাকে সৎ ও যোগ্য সন্তান দান করো। তখন আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম এক সুস্থির পুত্রসন্তানের। যখন ছেলেটি তাঁর পিতার সাথে চলাফেরা ও কাজ করার বয়সে উপনীত হয়, তখন ইবরাহিম বললেন-ছেলে! আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি বলো এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী? ছেলেটি বলেছিল-বাবা! আপনাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে পাবেন ধৈর্যশীল।” (সূরা সাফফাত : ১০০-১০২)

নবি যাকারিয়া আ. বয়োবৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন তিনি দেখলেন, আল্লাহ তায়ালা মৌসুম ছাড়াই গাছে ফল দান করেছেন। তিনি ভাবলেন, যে আল্লাহ বিনা মৌসুমে ফল দিতে পারেন, সে আল্লাহ বৃদ্ধ দম্পতিকেও সন্তান দান করতে পারেন। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন। নিঃসন্তান যাকারিয়া আ. আল্লাহর কাছে দুআ করেন এভাবে-

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاء﴿٣٨﴾ ِ
"হে রব! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম বংশধর দান করো। নিশ্চয় তুমি দুআ কবুল করে থাকো।” সূরা আলে ইমরান : ৩৮

আল্লাহ তায়ালা বয়োবৃদ্ধ যাকারিয়া আ.-এর দুআ কবুল করেন এবং দুআ কবুল করার কারণ কুরআন মাজিদে উদ্ধৃত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ " وَ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا

يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خُشِعِين﴿٩٠﴾ َ
“আমি যাকারিয়ার দুআ কবুল করলাম এবং তাঁর জন্য দান করেছি ইয়াহিয়াকে; আর তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে করে দিয়েছি (সন্তান ধারণের) যোগ্য। তাঁরা ছিল কল্যাণের কাজে

প্রতিযোগিতাকারী। তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভয় নিয়ে এবং তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত।” সূরা আম্বিয়া : ৯০

গ. সন্তান লাভের জন্য শিরকের পথ অবলম্বন না করা

আমাদের সমাজে বেশ কিছু অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রচলিত আছে। বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে না জানা বা কম জানাশোনা আছে এমন, সাধারণ মানুষদের মাঝে। এমনকি অনেক শহুরে ও শিক্ষিত মানুষদের মাঝেও এমন প্রবণতা দেখা যায়। তাদের অনেকে সন্তান লাভ করা এবং সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য শিরকের পথে পা বাড়িয়ে থাকেন।

এ ধরনের প্রচলিত কুসংস্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে-

মাজারে মানত করা।

মাজারে গিয়ে মৃত পীর-ওলির কাছে সন্তান প্রার্থনা করা।

জীবিত পীরের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে, তার পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করে সন্তান প্রার্থনা করা।

সন্তান লাভের জন্য গলায় তাবিজ ঝোলানো।

সন্তান জন্মের পর তাকে রক্ষার জন্য গলায় তাবিজ-মাধুলি ও অন্যান্য জিনিস ঝোলানো ইত্যাদি।

মূলত এসব কাজের মাধ্যমে সন্তান লাভের কোনো সুযোগ নেই। অনেক ক্ষেত্রে এসবের মাধ্যমে নারীদের ইজ্জত পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। আল্লাহ আমাদের এসব পাপ কাজ হতে হেফাজত করুন। সন্তান-সন্ততি দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ না চাইলে কোনোভাবেই সন্তান লাভ করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। যাকে ইচ্ছা ছেলে-মেয়ে উভয় সন্তানই দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করেন।" সূরা শুরা : ৫০

সুতরাং, সন্তান চাইতে হবে কেবল আল্লাহর কাছেই। একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর কাছে নেক ও সুস্থ সন্তান কামনা করে দুআ করতে হবে এবং তিনিই তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া দেবেন। সন্তান লাভের জন্য কখনোই অবৈধ ও অনৈসলামিক উপায় অবলম্বন করা যাবে না। নিঃসন্তান দম্পতির উচিত, আল্লাহর ওপর ভরসা করে উল্লিখিত দুআগুলোর ওপর আমল করা।

বর্তমানে অনেক উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। যাদের সন্তান প্রজননে সমস্যা রয়েছে, তারা এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারেন এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করার নির্দেশ ইসলামই আমাদের দিয়েছে।

সন্তান জন্মের পর করণীয়

একজন মুসলিম হিসেবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সব কাজই পরিচালিত হওয়া উচিত কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী। এটাই ঈমানের একান্ত দাবি। আর এটি শুরু হওয়া উচিত একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই। আর শিশুর জন্মের পর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তার জীবনে ইসলামকে সংযুক্ত রাখার মূল দায়িত্ব অভিভাবকের। সন্তান জন্ম হওয়া যেমন আনন্দের, সে সন্তানের প্রাথমিক কাজগুলো ইসলামের আলোকে পালন করাও আনন্দের। কেননা, এই অনুসরণ সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে পবিত্র ও সুন্দর জীবনের দিকে ধাবিত করবে এবং আল্লাহ তায়ালার দেওয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা হবে।

আমাদের প্রিয়নবি সা. হাদিস শরিফে সন্তান জন্মের পর অভিভাবকদের করণীয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সন্তানের জন্য অভিভাবকদের পক্ষ থেকে তা পালন করা জরুরি।

শোকর আদায় ও দুআ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে প্রথমেই মহান আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। আর দুআ করতে হবে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য বরকত ও কল্যাণ কামনা করে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে ইবরাহিম আ.-এর দুআ উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمٰعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي * * رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاء۰ ِ

“সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দান করেছেন ইসমাইল ও ইসহাককে। নিশ্চয় আমার রব দুআ শ্রবণকারী।

হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদেরও সালাত কায়েমকারী করুন। হে আমাদের রব। আমার দুআ কবুল করুন।” সূরা ইবরাহিম : ৩৯-৪১

নবজাতকের কানে আযান

জন্মের পর নবজাতককে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে কানে আযান দিতে হবে। আবু রাফে রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন-

قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. ِ

“ফাতিমার ঘরে হুসাইন ইবনে আলী ভূমিষ্ঠ হলে আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে নবজাতকের কানে নামাজের আযানের মতো আযান দিতে দেখেছি।” আবু দাউদ : ৫০১৭

অনেক সময়ই নবজাতকের কানে আযান দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। অথচ এটি নবি কারিম সা. থেকে একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবি ও তাবেয়িদের মধ্যে এ সুন্নাহর আমল প্রচলিত ছিল। মুহাদ্দিসগণ এর বিভিন্ন উপকারিতা বর্ণনা করেছেন; যেমন-পৃথিবীতে পদার্পণ করার পরই সর্বপ্রথম আল্লাহর বড়ত্বের ধ্বনি বাচ্চার মন-মস্তিষ্কে গ্রথিত করা, শয়তানকে আযানের ধ্বনি দিয়ে নবজাতক থেকে

বিতাড়িত করা ইত্যাদি। তাই এই সুন্নাহ পালন করতে যেন গাফলতি না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল করা উচিত।

তাহনিক করানো

সদ্যজাত শিশুকে মিষ্টিমুখ করানোকে হাদিসে 'তাহনিক' বলা হয়েছে। কয়েকটি হাদিস থেকে জানা যায়, কয়েকজন মহিলা সাহাবি সন্তান প্রসবের পর তাঁদের সন্তান এনে রাসূল সা.-এর কোলে দিয়েছেন। তিনি নবজাতকদের কোলে নিয়ে আদর করেছেন। খেজুর চিবিয়ে মিষ্টি রস তাদের মুখে দিয়েছেন তাদের জন্য বরকতের দুআ করেছেন। আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত-

وِلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. ِ

"আমার একটি ছেলে জন্ম নিলে আমি তাকে রাসূল সা.-এর কাছে নিয়ে এলাম, তখন রাসূল সা. শিশুর নাম রাখেন ইবরাহিম এবং তাকে তাহনিক করান খেজুর দিয়ে।" বুখারি: ৫০৭১

তাই জন্মের পর নবজাতকের মুখে নিজে অথবা কোনো পরহেজগার ব্যক্তির মাধ্যমে তাহনিক করা সুন্নাহ। তাহনিকের জন্য খেজুর বা মিষ্টি দ্রব্যের মধ্যে মধু দেওয়া যেতে পারে।

সুন্দর নাম রাখা

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সাত দিনের মধ্যে সুন্দর একটি নাম রাখা সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُم. ْ

"কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজ নামে ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে ডাকা হবে। অতএব, তোমরা সন্তানদের নাম সুন্দর করে নাও।" আবু দাউদ : ৪৯৪৮

সুন্দর অর্থবোধক ও শ্রুতিমধুর নাম রাখাটাই বাঞ্ছনীয়। পূর্ববর্তী নেককার ব্যক্তিদের নামে নাম রাখাটাও বরকতময়। নামের একটি প্রভাব মানুষের স্বভাবে পড়ে থাকে। এটি হাদিস ও আসারে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত। (তুহফা : ১২২-১২৩; রদ্দুল মুহতার: ৬/৪১৮)

এমন শব্দ দিয়ে নাম রাখা উচিত নয়, যার অর্থ অসুন্দর। আবার এমন নাম রাখাও উচিত নয়, যার অর্থ ভালো বটে, কিন্তু তাতে অহংকারের ছাপ থাকে। আর অর্থহীন নাম রাখাও অনুচিত। এ ধরনের নাম রাসূলুল্লাহ সা. বদলিয়ে সুন্দর অর্থবোধক নাম দিতেন। কোনো বিখ্যাত ফাসিক-ফাজিরের নামে সন্তানের নাম রাখাও অনুচিত।

আকিকা ও সদাকা

নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিন আকিকা করা এবং মাথা মুণ্ডন করে চুলের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ, রুপা তার মূল্য সদাকা করা সুন্নাত।
সামুরা ইবনে জুনদুব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন-

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى.

“প্রত্যেক সন্তানের আকিকার দায়বদ্ধতা রয়েছে। নবজাতকের পক্ষ হতে জন্মের সপ্তম দিনে আকিকার প্রাণী জবেহ করতে হবে। সেদিন নবজাতকের মাথা কামানো হবে এবং নাম রাখতে হবে।” ইবনে মাজাহ : ৩১৬৫

নবজাতকের কামানো চুলের পরিমাপে স্বর্ণ বা রুপা বা তার মূল্য সদাকা করা সুন্নাত। বেশিরভাগ বর্ণনায় রুপা সদাকা করার কথা এসেছে এবং অল্প কিছু বর্ণনায় স্বর্ণ সদাকা করার কথা বলা হয়েছে। অতএব, যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী স্বর্ণ বা রৌপ্য বা তার মূল্য সদাকা করতে হবে।

আলী ইবনে আবু তালিব রা. বর্ণনা করেন-

قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اخْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً

“রাসূলুল্লাহ সা. হাসানের পক্ষ থেকে বকরি আকিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন-হে ফাতিমা, তার মাথা মুণ্ডন করো এবং চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদাকা করো।” তিরমিযি : ১৫২৫

মাথার মাথা মুণ্ডনের পাশাপাশি হাত-পায়ের নখ ইত্যাদি পরিষ্কার করার নির্দেশনাও হাদিসে এসেছে। নবজাতকের মাথা মুণ্ডনের পর মাথায় জাফরান লাগানোও সুন্নাহ।

খতনা করা

পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠের ৭ দিন পর থেকে যেকোনো উপযুক্ত সময়ে খতনা করতে হবে। ৩ বছরের মধ্যে খতনা করা উত্তম। আর খতনা করার ঊর্ধ্ব বয়স ৭ বছর পার হওয়া উচিত নয়। তবে সাবালক হওয়ার আগেই খতনা করা জরুরি। খতনা করা নবিদের সুন্নাত এবং মুসলিম কালচারের অংশ।

শালদুধ

শিশুর জন্য শালদুধ অতি প্রয়োজনীয়। শিশু জন্মের পরপরই মায়ের বুকের যে হলুদ ও আঠালো দুধ নিঃসরিত হয়, সেটিই হলো শালদুধ। জন্মের পর পাঁচ দিন পর্যন্ত এই শালদুধ নিঃসরণ হতে পারে। অজ্ঞতাবশত মায়েরা অনেক সময় শিশুকে এটা না খাইয়ে ফেলে দেন। শিশুর সুস্থতার জন্য এই শালদুধের উপকারিতা অত্যধিক। এতে আছে ১০ শতাংশ আমিষ, লাকটোফেরিন, প্রচুর ভিটামিন এ, ইমিউনোগ্লোবিউলিন, ল্যাক্টো অ্যালবুমিন, ভিটামিন কে-সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ও শিশুর বিকাশে সহায়ক উপাদান। বাচ্চার জন্মের পরপর জন্ডিস হওয়া থেকে এটি রক্ষা করে। শালদুধের ইম্যুনোগ্লোবিন শিশুর রোগ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এ ছাড়াও শালদুধ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিপক্ষে শিশুর প্রথম প্রতিষেধক।

অনেক মা-ই ব্রেস্টফিডিংয়ের গুরুত্ব সেভাবে বুঝেন না। তাই ব্রেস্টফিডিং না করিয়ে শিশুকে ফর্মুলা দুধ দিয়ে থাকেন। এতে শিশুর দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, অ্যালার্জির ঝুঁকি বাড়া, বুদ্ধির বিকাশ কম হওয়া, হাঁপানি ও ফুসফুসের রোগ বেড়ে যাওয়াসহ নানান সমস্যা হতে পারে।

একজন নবজাতকের জন্য যেটুকু খাবারের প্রয়োজন, তা আল্লাহ তায়ালা মায়ের বুকেই ব্যবস্থা রেখেছেন। তাই পুষ্টিকর উপাদান নিশ্চিত করা এবং শক্তিশালী রোগ প্রতিরোেধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য প্রথম ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে কেবল ব্রেস্ট ফিডিংই করানো উচিত। এ ছাড়া অন্য কিছুই তার মুখে দেওয়া উচিত নয়। এরপর শিশুর দুই বছর পর্যন্ত ব্রেস্টফিডিং চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টিকর এবং নিরাপদ খাবার দেওয়া উচিত। আল্লাহ মায়ের মাঝে যে নিয়ামত দান করেছেন তা কোনো কারন ছাড়া সন্তানের থেকে পরিহার করা উচিত না।

প্রচলিত কুসংস্কার পরিহার করা

নবজাতকের জন্য করণীয় কাজগুলো করার পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, নবজাতকের সাথে সংশ্লিষ্ট শরিয়তে অপছন্দনীয় ও কুসংস্কার থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। নবজাতক সম্পর্কীয় ভ্রান্ত ধারণাগুলো থেকে মুক্ত থাকতে হবে। নবজাতক সংশ্লিষ্ট সেই ভুল কাজগুলো সম্পর্কে আমাদের সবারই স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত।

আযান-ইকামতে ছেলেমেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা একটি রেওয়াজ। ছেলে সন্তানের বেলায় আযান ও ইকামত দেওয়া এবং মেয়ে হলে না দেওয়া; ছেলের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া এবং মেয়ে সন্তানের বেলায় এর উলটো করা; অথবা ছেলে হলে বাড়ির বাইরে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে আযান দেওয়া আর মেয়ে হলে আযান-ইকামত কিছুই না দেওয়া-এই সবকিছুই ভুল। নবজাতক ছেলে হোক বা মেয়ে, কানে আযান-ইকামত দেওয়ার বিধানে কোনো ভিন্নতা নেই। কিবলামুখী হয়ে উভয়েরই ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত এবং উভয়ের বেলায়ই আযান ও ইকামত স্বাভাবিক হালকা আওয়াজে দিতে হবে।

নবজাতকের আযান দেওয়ার জন্য অনেক সময় পুরুষ কিংবা হুজুর জরুরি মনে করা হয়। কিন্তু নবজাতকের কানে আযান দেওয়ার জন্য আলেম হওয়ার আবশ্যকতা নেই। যেকোনো মুসলিম ব্যক্তিই আযান জানা থাকলে আযান দিতে পারে।

কোথাও কোথাও এমন প্রচলন দেখা যায় যে, মাথা কামানোর সময় মাথার মধ্যখানে কিছু চুল রেখে দেওয়া হয়। এভাবে কিছু চুল কেটে কিছু রেখে দিতে হাদিস শরিফে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারি : ৫৯২)

শিশুর কপালে কালো টিপ দেওয়া। অনেকে শিশুর জন্মের পর বদনজর থেকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে শিশুর কপালে টিপ দিয়ে থাকে। এটি ইসলাম নির্দেশিত কাজ নয়; বরং শিশুকে নানাবিধ অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য হাদিসে শেখানো যিকির ও দুআগুলোই কার্যকরী ও যথেষ্ট। আর বদনজর ও অন্যান্য অনিষ্ট থেকে বাঁচতে সূরা ফালাক, নাস ও আয়াতুল কুরসি পাঠ করা যেতে পারে।

সন্তানের গুরুত্ব মর্যাদা ও ফজিলত

রাব্বে কারীম আমাদের দান করেছেন অসংখ্য নেয়ামত। ইরশাদ হয়েছে :

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গুনতে শুরু করো, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

ব্যক্তি-জীবনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের যে সকল নেয়ামত দান করেছেন, তার মাঝে সন্তান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত।

সন্তানের জন্য নিঃসন্তান দম্পতির দৌড়ঝাঁপ হাহাকার আমাদের সুস্পষ্ট করে দেয়, সন্তান আমাদের জন্য কত বড় নেয়ামত। সন্তান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত যে, রাশি রাশি সম্পদও সন্তানের অভাব ঘোচাতে পারে না। যেই ঘরে বেশি বেশি সন্তান থাকে, সেই ঘর থাকে আলোকিত উচ্ছ্বসিত। ঘরের সন্তানরা পরিবেশ সবসময় মাতিয়ে রাখে। বেশি বেশি সন্তানলাভকারীর পিতামাতার জীবন আনন্দেই কাটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। "সন্তানের মর্যাদা ও গুরুত্ব" বিষয়টি ইসলামে অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এটি শুধু পারিবারিক একটি দিক নয়, বরং একটি ইবাদত, আমানত এবং মানবজাতির ধারাবাহিকতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা।" (সূরা আল-কাহফ: ৪৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সন্তান মানুষের জীবনে আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রশান্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে ইসলাম সন্তানকে শুধু দুনিয়াবি সুখের মাধ্যম হিসেবে দেখে না; বরং তাদেরকে একটি দায়িত্বপূর্ণ আমানত হিসেবে বিবেচনা করে। এজন্যই সন্তান লাভকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾

"তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।" (সূরা আশ-শূরা: ৪৯)

এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, সন্তান হওয়া সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, ফলে সন্তানকে অবহেলা করা বা অবমূল্যায়ন করা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

সন্তানদের গুরুত্ব আরেকটি দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, আর তা হলো—তারা পিতা-মাতার জন্য সাদাকায়ে জারিয়ার মাধ্যম হতে পারে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস ব্যতীত: সদাকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে।" (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, একজন সৎ ও নেক সন্তান পিতা-মাতার জন্য মৃত্যুর পরেও কল্যাণের উৎস হয়ে থাকে। তাই সন্তান শুধু দুনিয়ার সম্পদ নয়; বরং আখিরাতের সফলতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এছাড়াও, ইসলাম সন্তানের জীবন, সম্মান ও অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করেছে। জাহেলিয়াত যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার যে নৃশংস প্রথা ছিল, ইসলাম তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت﴾

“যখন জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে—কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?” (সূরা আত-তাকভীর: ৮-৯)

এই আয়াত সন্তানদের, বিশেষ করে কন্যা সন্তানের মর্যাদা ও অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

সন্তান পরিবার ও সমাজের ভবিষ্যৎ। তাদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা মানে একটি সুশৃঙ্খল ও নৈতিক সমাজ গড়ে তোলা। ইসলাম তাই সন্তানের শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং ঈমান-আকীদা ঠিক রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইসলামে সন্তান শুধু ভালোবাসার বস্তু নয়; তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা, একটি আমানত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের অন্যতম মাধ্যম। তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান ও সঠিকভাবে লালন-পালন করা প্রতিটি পিতা-মাতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আকিকা ও খৎনা সম্পর্কীয় অধিকার

সন্তান জন্মের পর আকিকা করা সুন্নাহ। আকিকা শিশুর অধিকার। সন্তান জন্মের পর শুকরিয়া আদায়ের নিদর্শন হিসেবে বাবা-মাকে সন্তানের জন্য আকিকা করতে হয়। এক্ষেত্রে সন্তান ছেলে বা মেয়ে যা হোক না কেন, উভয়ের জন্যই আকিকা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُه.

"প্রত্যেক নবজাতক তার আকিকার জন্য দায়বদ্ধ থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করবে, নাম রাখবে এবং মাথা মুণ্ডন করে দেবে।” তিরমিযি: ১৫২২

আকিকার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই নবি করিম সা. 'বন্ধক' থাকার কথা বলেছেন। আকিকা দিলে শিশু বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক সামর্থ্যবান পিতা-মাতার আকিকা দেওয়া উচিত। আকিকা সপ্তম দিনে করাই উত্তম। তা সম্ভব না হলে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহের মাথায় করলেও হবে। তাও সম্ভব না হলে জীবনে যেকোনো সময় করলেই হবে।

ছেলের পক্ষ থেকে দুটি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকিকা করা উত্তম। উম্মে কুরয রা. বলেন, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি-

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، مِثْلَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة ٌ

"পুত্রসন্তানের জন্য দুটি সম মানের ছাগল এবং কন্যাসন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল (আকিকা দেবে)।" আবু দাউদ: ২৮৩৬

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন-

إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ فَعُقُّوا عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة ٌ

.

"ইহুদিরা পুত্রসন্তানের আকিকা করত; কিন্তু কন্যাসন্তানের আকিকা করত না। তোমরা পুত্রসন্তানের জন্য দুটি ছাগল এবং কন্যাসন্তানের জন্য একটি ছাগল দিয়ে আকিকা করো।" বায়হাকি: ১৯৭৬০

আকিকা করা কার দায়িত্ব

যিনি সন্তানের লালনপালন কিংবা ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করছেন, তিনিই সন্তানের আকিকা আদায় করবেন। তাই প্রথমত, এই দায়িত্ব পিতার ওপর ন্যস্ত হয়। পিতার সামর্থ্য না থাকলে সেক্ষেত্রে মা সামর্থ্যবান হলে তিনি অথবা তাদের পক্ষ থেকে দাদা-দাদি বা নানা-নানি আকিকা আদায় করবেন। (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ : ৩০/২৭৭)

আকিকার প্রাণী

উট, গরু, মহিষ, ভেড়া বা ছাগল দিয়ে আকিকা করতে হবে। অর্থাৎ, যে প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা বৈধ, সেই প্রাণী দিয়ে আকিকা করাও বৈধ। যে প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা বৈধ নয়, সেই প্রাণী দিয়ে আকিকা করাও বৈধ নয়। তাই আকিকার ক্ষেত্রে পশুর বয়স ও ধরনের দিক থেকে কুরবানির পশুর গুণ পাওয়া যায়, এমন প্রাণীই নির্বাচন করতে হবে। কুরবানির পশুর মতোই আকিকার পশুও সুস্থ, সবল ও ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

কুরবানির পশুর সঙ্গেও আকিকা করা বৈধ। যেমন, একটি পশুতে তিন শরিক কুরবানি হলে সেখানে আরও দু-এক শরিক আকিকার জন্যও দেওয়া যেতে পারে। (দুরারুল আহকাম ১/২৬৬)

আকিকার গোশত বণ্টন

আকিকার গোশতের হুকুম কুরবানির গোশতের মতোই। কুরবানির গোশত যেভাবে বণ্টিত হয়, সেভাবে আকিকার গোশতও বণ্টিত হবে। কাঁচা ও রান্না করা উভয়টিই বণ্টন করা যাবে। যে কেউ তা খেতে পারবে। শিশুর মা-বাবা, নানা-নানি, সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, ধনী-গরিব, মিসকিন সবাই আকিকার গোশত খেতে পারবে। আকিকার পশুর গোশত খেতে কারও কোনো বাধা নেই।

আকিকার মাধ্যমে নবজাতক শিশুর বাবা-মায়ের দানশীলতা প্রকাশ পায়। গরিব, ইয়াতিম ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে গোশত বিলি-বণ্টনের মাধ্যমে আত্মীয়তার হক আদায় হয়। নবজাতক শিশুর জন্য সবাই দুআ করেন।

আকিকা নিয়ে কিছু কুসংস্কার আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন, আকিকার পশু শিশুর নানার বাড়ি থেকে দিতে হয়। আকিকার গোশত বাবা-মা, নানা-নানি ও দাদা-দাদিরা খেতে পারেন না। সন্তানের চুল মুণ্ডানোর সময় মাথার তালুর ওপর ক্ষুর ধরে রেখে আকিকার পশু জবাই করতে হয় ইত্যাদি। এসব কুসংস্কার থেকে দূরে থাকতে হবে। আকিকা করতে হয় নবজাতকের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। তাই আকিকাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় কুসংস্কার, বদ রসম ও কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

খতনার বিবরণ

শিশুদের মধ্যে কিছুটা সহনশক্তি তৈরি হওয়ার পরেই গোপনে হাজাম ডেকে খতনা করিয়ে দেবে।

ঘা শুকিয়ে যাওয়ার পর গোসল করিয়ে দেবে।

যদি সামর্থ্য থাকে এবং নিজের ওপর কোনো প্রকার চাপ অনুভব না হয়, তবে কোনো প্রকার সুনাম-সুখ্যাতির নিয়ত না করে আল্লাহ পাকের শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং দুই-চারজন মিসকিনকে খাবারের আমন্ত্রণ করবে। তবে এই নিয়মও বারবার চালু রাখবে না। অন্যথায় এটাও কুপ্রথায় পরিণত হবে।

খতনা উপলক্ষে চিঠির মাধ্যমে কিংবা লোক পাঠিয়ে মানুষ জড়ো করা সুন্নতের পরিপন্থী। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান বিন আবিল আস (রা.)-কে কেউ খতনা উপলক্ষে দাওয়াত করলে তিনি সেই দাওয়াতে যেতে অস্বীকার করলেন। পরে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় আমরা (খতনার দাওয়াতে) যেতাম না।

উপরের বিবরণ দিয়ে এটা জানা গেল যে, যে বিষয়টি জানাজানি করার ব্যাপারে শরিয়ত কোনো গুরুত্ব দেয়নি; সেই বিষয়ে লোকজনকে জড়ো করা সুন্নতের পরিপন্থী। অথচ আজকাল এই খতনা উপলক্ষে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বহু নিয়ম-প্রথা পালন করা হচ্ছে। হযরত ওসমান বিন আবিল আস (রা.) কর্তৃক খতনার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার ঘটনা দিয়ে এটা জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম এই দাওয়াত পছন্দ করতেন না। এর কারণ হলো, কোনো বিষয়ে মানুষকে আহ্বান করার অর্থ হলো সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া। তো শরিয়ত যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি তাকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন নিয়ম চালু করা।

এই কারণেই হযরত ওমর (রা.) লোকজনকে চাশতের নামাজে মসজিদে জড়ো হতে দেখে ওটাকে বেদআত আখ্যা দিয়েছিলেন। এর ভিত্তিতেই ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ নফল নামাজের জামায়াতকে মাকরূহ বলেছেন।

বালেগ হওয়ার পর খতনা করার অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো (চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে যে অতিরিক্ত ব্যথা হবে তা) সহ্য করার শক্তি থাকতে হবে। খতনার

প্রয়োজনে তার শরীর দেখা এবং হাত লাগানো জায়েজ আছে। (তবে যাদের এই কাজে কোনো প্রয়োজন নেই তারা দেখতে পারবে না)।

"কোনো কোনো সময় দেখা যায় বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে খতনা করা হয়। এই বয়সের ছেলেদের খতনার সময় খতনার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কারও তার গুপ্তাঙ্গ দেখা হারাম। অথচ এই সময় অনেকেই নির্দ্বিধায় তাকিয়ে দেখে এবং গুনাহগার হয়।"

খতনা উপলক্ষে প্রদত্ত দ্রব্যের মাসআলা

খতনা বা এই জাতীয় অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের যা কিছুই দেওয়া হয়, প্রকৃত অর্থে তা কিন্তু ওই বাচ্চাকে দেওয়া হয় না। বরং বাচ্চাকে উপলক্ষ করে তার বাবা-মাকেই দেওয়া হয়। সুতরাং বাবা-মাকেই ওই সব জিনিসের মালিক মনে করা হবে। তারা নিজেদের ইচ্ছা মতোই তা ব্যবহার করতে পারবেন।

অবশ্য কেউ যদি নির্দিষ্টভাবে ওই বাচ্চাকেই তা দিয়ে থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে তাকেই তার মালিক মনে করতে হবে। বাচ্চা যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে তার মালিক হওয়ার জন্য সে নিজে তা গ্রহণ করাই যথেষ্ট হবে। আর বাচ্চা যদি নিজে তা গ্রহণ না করে বা গ্রহণ করার উপযুক্ত না হয়, তবে তার পক্ষ থেকে তার বাবা এবং বাবা না থাকলে দাদা গ্রহণ করলেই বাচ্চা তার মালিক হয়ে যাবে। যদি বাবা-দাদা কেউই না থাকে, তবে সে যে ব্যক্তির দায়িত্বে বড় হচ্ছে (প্রতিপালিত হচ্ছে) সে গ্রহণ করবে।

সন্তানের হক্ব ও অধিকার

বাবা-মায়ের ওপর সন্তানের অনেক অধিকার রয়েছে। সন্তানের চরিত্র গঠন এবং তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব। অনেক বাবা-মা নিজের সন্তানদের বিভিন্ন নেয়ামত দিয়ে যত্নে লালন-পালন করেন ঠিকই, কিন্তু তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব পালন করেন না।

শৈশবেই যদি ছেলেমেয়েদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া এবং চরিত্র গঠন করা না হয়, তবে বড় হওয়ার পর তার পরিণতি খুবই খারাপ হয়। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে—

<يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليلم نارا

> **অর্থ:** হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে দোজখ (জাহান্নাম) থেকে রক্ষা করো।

উপরের আয়াতের তাফসিরে হজরত আলী (রা.) বলেছেন— পরিবারবর্গকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দাও। এর দ্বারা জানা গেল যে, নিজের স্ত্রী-সন্তানকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া ফরজ, অন্যথায় তার পরিণতি হবে দোজখ।

সন্তানের পার্থিব অধিকার হলো, তাদেরকে এমন কাজ শিক্ষা দেবে যার মাধ্যমে দুনিয়াতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে।

হজরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের ছেলেদেরকে—

সাঁতার কাটা ও তীর নিক্ষেপ করা শিক্ষা দাও এবং মেয়েদেরকে চরকা কাটা শিক্ষা দাও। – বায়হাকী

হাদীসের অর্থ শুধু এই তিনটি কাজ শিক্ষা দেওয়াই নয়; বরং পৃথিবীতে জীবনযাপন করার এবং জাতীয়তা রক্ষা করার জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় হবে, সেগুলোর সবই শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকদের কর্তব্য।

দ্বীনদার-পরহেজগার এবং শালীন ও ভদ্র মেয়ে দেখে বিয়ে করবে, যাতে নেক সন্তান জন্ম নেয়। শৈশবে আন্তরিক মহব্বত ও ভালোবাসার সাথে তাদের পরিচর্যা ও প্রতিপালন করবে। সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা পোষণেরও বহু ফজিলত এসেছে। দুধ পানের জন্য যদি ধাত্রী নিয়োগ করতে হয়, তবে দ্বীনদার-পরহেজগার নারী ঠিক করবে। কারণ, সন্তানের চরিত্রে দুধেরও প্রভাব পড়ে। কন্যাসন্তান প্রতিপালনের অধিক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে যত্ন করতে কখনো অবহেলা করবে না। ছেলেমেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর উত্তম পাত্র-পাত্রী দেখে তাদের বিয়ে দেবে। যদি মেয়ের স্বামী মারা যান, তবে তার দ্বিতীয় বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের ঘরে যত্নের সাথে রাখবে। তার জীবনধারণে যা যা প্রয়োজন, সেগুলোর সবকিছু জুগিয়ে দেবে।

একটি ঘটনা

একবার এক ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর দরবারে গিয়ে নিজের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে আমার হক আদায় করে না। হযরত ওমর (রাঃ) এই

বিষয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দিল, হে আমীরুল মোমেনীন! কেবল সন্তানের ওপরই পিতার হক আছে, না পিতার ওপরও সন্তানের কিছু হক আছে?
হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, পিতার ওপরও সন্তানের কিছু হক আছে। ছেলেটি বলল, আমি সেই সব হকের বিবরণ শুনতে চাই।
এবার আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, পিতার ওপর সন্তানের হক হলো—
সুসন্তান লাভের উদ্দেশ্যে নেক ও পরহেজগার স্ত্রী গ্রহণ করা।
সন্তান জন্ম হওয়ার পর ভালো দেখে তার নাম রাখা (কেননা, ভালো নামের বরকতে ছেলের ওপর ভালো প্রভাব পড়ে)।
শিশুর বয়স বাড়ার পর তার হুঁশ-জ্ঞান হলে তাকে আদব-কায়দা ও দীনের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।
উপরোক্ত বিবরণ শুনে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "হে আমীরুল মুমেনীন! আমার বাবা এই সব অধিকারের একটিও পূরণ করেননি। আমি জন্ম নেওয়ার পর তিনি আমার এমন একটি নাম রাখলেন, যার অর্থ হলো পায়খানার কীট। তিনি আমাকে দীনি শিক্ষার একটি অক্ষরও শেখাননি।"
এই কথা শুনে হযরত ওমর ভীষণ রাগ করলেন এবং লোকটির অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে তাকে বললেন, "আগে তুমি নিজের অন্যায়ের প্রতিকার করো, পরে ছেলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ কোরো। তুমি নিজেই ছেলের অধিকার বেশি নষ্ট করেছ। যাও, নিজের সন্তানের প্রতি কখনো এই রকম আচরণ কোরো না।" মোটকথা, যথাযথভাবে সন্তানের অধিকার আদায় না করলে তার পরিণতি খারাপ হবেই।

সন্তানের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

প্রত্যেক মা'ই এটা চায় যে, তার সন্তান তার অন্তরের শান্তি এবং চক্ষু শীতলকারী হোক। দুনিয়া এবং আখিরাতে তার জন্য ইজ্জত ও আরামের মাধ্যম হোক। তার বংশ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হোক। আপনার এ আকাঙ্ক্ষা নিসন্দেহে মর্যাদা পাবার যোগ্য। কিন্তু কোনো আকাঙ্ক্ষাই শুধু দোয়ার মাধ্যমে পূরণ হয় না। আপনাদের দোয়া পবিত্র, আপনাদের আকাঙ্ক্ষাও পবিত্র; কিন্তু শুধু দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। নিজের দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে চেষ্টার হক আদায় না করলে তা কখনো সাফল্যের রূপ দেখবে না।

সন্তানের ভালো এবং উন্নত ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা কে না করে থাকে। কোনো মা এ আশা করে যে, তার সন্তান ভ্রষ্ট পথে চলুক? সন্তানের খারাপ কাজ এবং পথভ্রষ্টতায় কার না অন্তরে বাজে। সন্তান যদি লজ্জিত এবং ব্যর্থ হয় তাহলে কোন্ মা'র চক্ষু দিয়ে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত না হয়। আর সন্তানের সার্থক ভবিষ্যত দেখে কোন্ মা খুশীতে বাগ বাগ না হয়। কিন্তু শুধু ভালো আবেগ-অনুভূতি দিয়েই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন হলো তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া এবং তাদের অধিকার আদায়ের পুরো চেষ্টা করা। আপনি নিজের দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালনের পরই সন্তানদেরকে অধিকার আদায়ের শিক্ষা দিতে পারেন। আপনি যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই না রাখেন তাহলে আপনি তাদের অধিকার কিভাবে আদায় করবেন।

সন্তানের অধিকারসমূহ আদায়ে আপনাকে এজন্যও তৎপর হওয়া প্রয়োজন যে, এটা আপনার দীনি দায়িত্ব। তাদের অধিকারসমূহ আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং একদিন তিনি এ ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ হলো:

"এবং মহিলা নিজের স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক। তোমরা সবাই (নিজ নিজ অবস্থা) অনুযায়ী রক্ষক এবং তোমাদের সক নিকটই তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।"-বুখারী ও মুসলিম

নিসন্দেহে পিতাও নিজের সন্তানের রক্ষক এবং তাদের অধিকারসমূহের জিম্মাদার। কিন্তু এটা বাস্তব যে, মা'র দায়িত্ব কিছুটা বেশী। পিতা জীবিকার জন্যে দৌঁড়-ঝাপের কারণে বেশীর ভাগ সময় ঘরের বাইরে অবস্থান করে। গৃহে সবসময় মাতাই শিশুদের সাথে থাকেন এবং শিশুও মা'র প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়। শিশুদের উপর খেয়াল দেয়ার জন, প্রকৃতিগতভাবেই মা বেশী সময় এবং শিশুও মায়ের প্রভাব কিছুটা বেশী গ্রহণ করে।

আর এটাও বাস্তব যে, শিশুদের দায়িত্বাবলী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন এবং তাদের অধিকারসমূহের হক আদায়ে যে উচ্চাঙ্গের নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলীর প্রয়োজন তা আল্লাহ পাক নিজের হিকমতের অধীন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরকেই কিছুটা বেশী দান করেছেন। ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানী, দয়া ও নম্রতা এবং ভালোবাসার মৌলিক

গুণাবলী পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশী দান করা হয়েছে। আর এজন্যই তাদের উপর আল্লাহ পাক যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালনের জন্য ঐসব গুণাবলীর বেশী প্রয়োজন।

সন্তানের ৭টি অধিকার

এক: সন্তানের কদর ও মূল্য

দুই: লালন-পালন

তিন: সুন্দর আচরণ

চার: ভালো নাম রাখা

পাঁচ: স্নেহ ও ভালোবাসা

ছয়: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং

সাত: বিয়ে।

সন্তানের কদর ও মূল্যঃ সন্তানের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তার প্রতি আপনার মর্যাদা ও মূল্যের অনুভূতি থাকা। তার অস্তিত্বকে জীবনের মুসিবত মনে করে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং সন্তানকে নিজের জন্য আল্লাহর রহমাত ও পুরস্কার মনে করা প্রয়োজন। আপনি যদি তার অস্তিত্বের মূল্য দিতে সফল না হন তাহলে তার অন্যান্য অধিকার কখনই আদায় করতে পারবেন না অথবা অন্যান্য অধিকার আদায়ের সুযোগই আপনি দেবেন না অথবা এ সুযোগ এলেও আপনি অধিকার আদায়ে সফল হতে পারবেন না।

সন্তানের সাথে সঠিক আচরণের জন্য তার সঠিক মর্যাদা ও মূল্য জানা অতি আবশ্যকীয় ব্যাপার। সন্তান আল্লাহর মহান নেয়ামত। সন্তান ঘরের শোভা, খায়ের ও বরকত এবং দীন-দুনিয়ার কল্যাণের সমান। সন্তান দুনিয়ায় আপনার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং জীবনের সাহারা বা সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচিত। আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। আপনার প্রিয় ধ্যান-ধারণা বা আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যম হ আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রথাকে সে অব্যাহত রাখে এবং আপন... উত্তরাধিকার হয়ে পরবর্তীতে সে আপনার কীর্তিকে জীবিত রাখে।

দীনি দৃষ্টিকোণ থেকেও সন্তান আল্লাহর নজীরবিহীন পুরস্কার। দীনি কাজে সে আপনার উত্তম সাহায্যকারী ও উত্তরাধিকার। দীনি কাজের জবাবদিহিতে সে আপনার চক্ষু শীতলকারী ও অন্তরের শান্তি। আপনার দীনি প্রথা ও আদর্শের সংরক্ষক এবং উত্তরাধিকার। এজন্যেই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট দোয়া করেন:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَة- ً

“হে আমার আল্লাহ! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করো।"

এ দোয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিলো। তাহলো, সন্তান তার পর দীনি উত্তরাধিকার হবে এবং পিতার মিশন পূর্ণ করবে।

فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنكَ وَلِيًّا - يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب- َ

“(হে আমার রব) তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকার দান করো। এ উত্তরাধিকার আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও পাবে।"

অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরিবার থেকে দীনের যে আলো প্রসারিত হয়েছিলো তার ওয়ারিস হবে এবং সে আলো কখনো নির্বাপিত হতে দেবে না। সত্য কথা হলো, নেক সন্তান দুনিয়াতেও বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম এবং আখেরাতেও অফুরন্ত সওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম হয়ে থাকে।

জান্নাতে বিশেষ মহল

আপনার জীবদ্দশায় যদি সন্তানের মৃত্য হয় এবং আপনি সে মৃত্যু শোক সবর ও ধৈর্যের সাথে বরদাশত করেন তাহলে সন্তান আপনার জন্য আখেরাতের সঞ্চয়, জান্নাতের ওসিলা এবং বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম হবে। এ সবরের বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে জান্নাত প্রদান করবেন এবং সেখানে আপনার জন্য একটি বিশেষ ধরনের মহল তৈরি করবেন। সে মহলের নামই হবে "শোকরের মহল।" হযরত আবু মূসা আশত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُوهُ بَيْنَ الْحَمْدِ - جامع ترمذى

"যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করে নিয়েছো। ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হাঁ। কবজ করে নিয়েছি। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তোমরা তার কলিজার টুকরার রূহ কবজ করেছো! ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হাঁ, কবজ করেছি। এ সময় আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, অতপর আমার বান্দাহ কি বলেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, (পরওয়ারদিগার) তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করেছে। এবং এ মুসিবতে সে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েছে। একথা শুনে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বান্দার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরির এবং সে মহলের নাম "শোকরের মহল" রাখার নির্দেশ দেন।"

"হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে মুসলমান দম্পতিরই তিনটি নাবালেগ শিশু মারা যায় তাহলে এ শিশুরা কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং যখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হবে তখন এসব নিষ্পাপ শিশু জবাব দেবে যে, যতক্ষণ আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে দাখিল না হবে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে যেতে পারি না। তখন আল্লাহ নির্দেশ দেবেন যে, যাও তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা সকলেই জান্নাতে যাও।"-তিবরানী

সন্তান সাদকায়ে জারীয়াহ

সন্তানের জীবদ্দশায় আপনি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তাহলে সন্তান আপনার জন্য এমন এক সাদকা হিসেবে পরিগণিত যার সওয়াব দুনিয়া থাকা পর্যন্ত আপনার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করতেই মানুষের আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি নেক সন্তান রেখে যায় তাহলে তা এমন এক নেক আমল হবে যার সওয়াব লেখা হতে থাকে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ - صحيح مسلم

"যখন মানুষ ওফাত পায় তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ (এসবের সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকেন)। কাজ তিনটি হলো, এমন সাদকাহ প্রদান যা তার পরও অব্যাহত থাকে। অথবা এমন ইলম বা জ্ঞান পরিত্যাগ করে যান যে তারপরও মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে থাকেন। অথবা এমন নেক সন্তান রেখে যান যে, মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করতে থাকে।"

“হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করে মাইয়্যেতের মর্যাদা বুলন্দ হয় তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিতে এটা কেমন করে হলো? আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছে এবং আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেছেন।"

"হযরত ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! আবু হুরাইরাকে ক্ষমা করো। হে পরওয়ারদিগার! আবু হুরাইরার মা'কে ক্ষমা করো এবং পরওয়াদিগার! সে সকল লোককেও ক্ষমা করে দাও যারা আবু হুরাইরা ও তার মা'র জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। সুতরাং আমরা বরাবর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার মা'র

জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে থাকি। যাতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়ায় শামিল থাকি।"

সন্তান হত্যা জঘন্যতম পাপঃ মুসলমান সমাজ যদিও বর্তমানে দুঃখজনক পশ্চাৎগমন এবং শিক্ষণীয় পতনে ক্ষত-বিক্ষত। বিশ্বে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া ও উন্নতি অর্জনের সাহসও হারিয়ে বসেছে এবং আখেরাতে বুলন্দ মর্যাদা হাসিলের শিক্ষাও ভুলে গেছে। এ সত্ত্বেও তাওহীদে এবং দীনের মৌলিক শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রক্ষার বদৌলতে মুসলমান মহিলাদেরই এ বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যে, তারা কিছু গুনাহর ব্যাপারে চিন্তাও করতে পারে না। যেসব গুনাহতে অন্যান্য মহিলা লিপ্ত রয়েছে অথবা খুব সহজেই তাতে লিপ্ত হতে পারে।

মুসলমান মহিলা চিন্তাও করতে পারে না যে, সে নিজের নিষ্পাপ শিশুকে নিজের হাতে হত্যা করে ফেলবে। ইসলাম এ মারাত্মক পাপ নির্মূল করার জন্য একদিকে মাতা-পিতার অন্তরে মানব জীবনের মর্যাদার গভীর অনুভূতি এবং সন্তানের কদর ও মূল্য সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে সন্তান হত্যাকে এতো সঙ্গীন পাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যে, তাকে শিরকের মতো জঘন্য গুনাহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ - - الانعام : ١٥١

"(হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন যে, এসো আমি তোমাদেরকে বলি কাউকে শরীক করো না। এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করা ও দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না।"-সূরা আল আনআম: ১৫২

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভয়ানক যুলুম থেকে সমাজকে পবিত্র করার উপর এতো গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন যে, বাইয়াতে আকাবাতে তিনি সর্বপ্রথম আনসারদের নিকট থেকে যেসব জরুরী বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিলো, তারা যেন সন্তানদেরকে হত্যা না করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যেসব মহিলা হাজির হতেন তাদের নিকট থেকেও তিনি সন্তান হত্যা না করার ওয়াদা নিতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যে সকল মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিলো তার এক দফায় সন্তান

হত্যা না করার ওয়াদা সন্নিবেশিত ছিলো। ঈদের সাধারণ সমাবেশে তিনি মহিলাদের এলাকাতে তাশরিফ নিতেন এবং তাদের নিকট থেকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে এ ব্যাপারেও ওয়াদা নিতেন।

"হযরত উবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন সামেত বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমার নিকট একথার উপর বাইয়াত করো যে, তোমরা কাউকে আল্লাহর সাথে অংশীদার বানাবে না, চুরি করবে না, বদ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না। যে ব্যক্তি এ ওয়াদা পূরণ করবে তার পারিশ্রমিক আল্লাহর জিম্মায়। আর যে ব্যক্তি তার মধ্য থেকে কোনো খারাপ কাজ করলো এবং তাকে আইনের অধীন শাস্তি প্রদান করা হলো তাহলে তা হবে তার গুনাহর কাফ্ফারা। আর যার গুনাহ দুনিয়াতে কারোর উপর প্রকাশ পেলো না তাহলে আল্লাহর ইখতিয়ার রয়েছে চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন এবং চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন।"

সন্তান প্রতিপালনঃ

সন্তানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তাদের লালন-পালন। সন্তান অস্তিত্বের জন্য যেমন মাতা-পিতার মুখাপেক্ষী তেমনি বৃদ্ধি ও লালন-পালন এবং তত্ত্বাবধানের জন্যও মাতা-পিতার মুখাপেক্ষী। শিশুর শৈশবকাল অত্যন্ত অসহায়ত্বের কাল। এ সময় যদি মাতা-পিতার অভিভাবকত্ব ও লালন-পালনের সুযোগ না পায় তাহলে সে যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। এজন্য ইসলাম সন্তানের কদর ও মূল্য বর্ণনার পর তাকে ভালোভাবে লালন পালনের দ্বিতীয় অধিকার বর্ণনা করেছে।

সন্তান প্রতিপালন একটি স্বভাবজাত প্রবণতাঃ সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এবং তার প্রতিপালনের আবেগ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আল্লাহ পাক এ প্রবৃত্তি প্রত্যেক মাতা-পিতার অন্তরেই সৃষ্টি করেছেন। মাতা-পিতা মুসলমান হোক বা না হোক, কোনো ধর্ম বা আল্লাহতে বিশ্বাসী হোক বা না হোক, তাতে কোনো তারতম্য নেই।

মানব বংশের স্থায়ীত্ব এবং এ দুনিয়া আবাদ রাখার অতীব প্রয়োজনেই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সন্তান প্রতিপালনের প্রবৃত্তি এবং স্পৃহা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এজন্য কোনো পার্থক্য ছাড়া প্রত্যেক মাতা-পিতাকে সহজাত আবেগ দান

করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রত্যেক মানুষের মনে সাধ জাগে যে, তারপর তার সন্তান তার স্থান দখল করুক। তার নাম জীবিত রাখুক। তার সহায়-সম্পদের উত্তরাধিকার হোক এবং তার ইতিহাস, তাহজীব এবং নিয়ম প্রথারও উত্তরাধিকার হোক। সন্তান নিজের শরীর এবং আত্মারই একটি অংশ। এজন্য প্রকৃতিগতভাবেই তার জীবন মাতা-পিতার নিকট প্রিয় হওয়া প্রয়োজন। যেসব মানুষ সন্তান প্রতিপালনের এবং তার আবেগ-অনুভূতির সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন তারাও সহজাত স্নেহ-ভালোবাসার অধীন সন্তান প্রতিপালন উত্তম কর্তব্য এবং ভালো কাজ হিসেবেই মনে করে। শিশুর খাতিরে সব ধরনের কষ্ট সহ্য করা এবং অব্যাহত ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য একজন মহিলার এ বন্ধনই যথেষ্ট যে, সে শিশুর মা। ইসলামের উপর ঈমান আনুক অথবা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাসী হোক অথবা কোনো ধর্ম সম্পূর্ণ নাই মানুক, তাতে কিছু আসে যায় না।

পক্ষান্তরে মাতা-পিতার প্রতি ইহসান এজন্য যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর সন্তান প্রতিপালনের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ অধিকার মাতা-পিতা কখনই আদায় করতে পারতো না, যদি তাদের সন্তানের প্রতি ভালোবাসার বিরাট আবেগ সৃষ্টি না হতো।

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর রহমাত এবং হিকমতের নিদর্শন এবং তিনি রব বা প্রতিপালক হবার প্রকাশ্য দলিল। কোনো বৈষম্য ছাড়া আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এ আবেগ সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানুষই নয়, বরং জীব-জন্তুদেরকেও আল্লাহ এ আবেগ দান করেছেন এবং তারা প্রকৃতিগতভাবে নিজের বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে থাকে।

প্রতিপালনের প্রশ্নে মুসলমান মা'র পার্থক্য

সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ এবং তার প্রতিপালনের আবেগ অনুভূতি আল্লাহ পাক সকল মা-কেই দান করেছেন। মুসলমান মা এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মা উভয়েই সহজাত প্রবৃত্তির অধীন সন্তান প্রতিপালন করে থাকে। কিন্তু উভয়ের ধ্যান-ধারণা, শ্রম দানের কারণ, কর্মপদ্ধতি এবং চেষ্টার প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

ইসলাম থেকে বঞ্চিত মা সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে যা কিছু চিন্তা করে অথবা চিন্তা করতে পারে তা এ নশ্বর দুনিয়া পর্যন্তই সীমিত। মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে তার দৃষ্টি অনন্ত জগত পর্যন্ত প্রসারিত হয় না। নিজের সন্তান হওয়ার কারণে সে তার লালন-

পালন করে। তার অন্তরে সন্তানের প্রতি মমত্ববোধের সীমাহীন আবেগ রয়েছে। সন্তান প্রতিপালন দুনিয়ায় একটি উত্তম কাজ এবং এ সহজাত আবেগের কারণেই সে তা করে।

সে এ চিন্তা করে যে, সন্তানের মাধ্যমে তার বংশ টিকে থাকবে অথবা সন্তান বড়ো হয়ে তাকে আরাম ও শান্তি দেবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। এ ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সে নিজের সন্তানকে এমনভাবে প্রতিপালন করে যাতে সে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে স্বার্থক জীবন-যাপন করতে পারে।

মুসলমান মা-ও সন্তানের প্রতি সীমাহীন মমত্ববোধের কারণে লালন-পালন করে থাকে। সন্তান তার বংশের স্থায়ীত্ব টিকিয়ে রাখার মাধ্যম একথাও সে মনে করে। সে তার জীবনের সাহায্যকারী এবং বার্ধক্যকালীন আশ্রয় স্থল। কিন্তু পার্থক্য হলো যে, সে সন্তান প্রতিপালনকে একটি দীনি দায়িত্ব এবং আখেরাতের মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম মনে করে। উপরন্তু মুসলমান মাতা-পিতা সন্তান প্রতিপালনে নিজেকে ইসলামী হুকুম-আহকামের অধীন করে নেয়। সন্তানের জীবনের লক্ষ্য শুধু দুনিয়ার জীবনে সচ্ছলতা ও আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করার জন্য মুসলমান মাতা-পিতা সন্তান প্রতিপালন করে না বরং তারা নিজের অভিভাবকত্বে এমন মুজাহিদ তৈরি করে যাদের দৃষ্টি সুদূর প্রসারী হয় যারা দুনিয়া আল্লাহর মর্জি মুতাবেক জীবন কাটানো এবং আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দুনিয়ায় জীবিত থাকে এবং মারা যায়।

মুসলমান মাতার নিকট সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্নটি শুধু পার্থিব দুনিয়ার ব্যাপারই নয়, বরং তার ভালো-মন্দের প্রভাব সে জীবনেও প্রতিভাত হবে যাকে পরকালীন জীবন বলা হয়। আর এ পরকালীন জীবনের উপর সে ঈমান রাখে। তার চিন্তার ধরন এ হয় যে, সে যদি সন্তানকে ইসলামী ধ্যান-ধারণায় গড়ে তোলে এবং ইসলামী নির্দেশ মুতাবেক লালন-পালন করে তাহলে তার পরকালীন জীবন সুন্দর হবে। আল্লাহ তার উপর খুশী হবেন এবং তাকে জান্নাত দান ও পুরস্কারের বারি বর্ষণ করবেন। যদি সে এ দায়িত্ব পালনে দুর্বলতা দেখায় অথবা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে না তোলে তাহলে পরকালে লজ্জিত হবে এবং আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং শাস্তি দেবেন।

মাতৃত্বের মমতায় বাধ্য হয়েও মুসলমান মাতা সন্তান প্রতিপালন করেন এবং এ দুনিয়াতেও তার ভালো প্রতিদান চান। কিন্তু সাথে সাথে তার বদলা ও প্রতিদানের সেদিনও প্রত্যাশী হবেন যেদিন এ দুনিয়ার তুলনায় প্রতিদানের বেশী মুখাপেক্ষী হবেন। সে প্রতিদান চিরস্থায়ী হবে।

যে মা ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত সে কখনো মুসলমান মায়ের মতো সন্তানের প্রতি ভালোবাসার আবেগ অনুভব করতে পারে না। সহজাত আবেগের সাথে সাথে যদি ঈমানী আবেগ যুক্ত হয় তাহলে স্নেহ ও আন্তরিকতার যে গভীরতা সৃষ্টি হয় তা অমুসলিম মায়ের অন্তরে সৃষ্টি হতে পারে না। উপরন্তু মুসলমান মা'র অন্তরে মৌলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে যে আনন্দ ও শক্তি সৃষ্টি হয় তা অমুসলিম মায়ের অন্তরে সৃষ্টি হতে পারে না।

এ ধরনের চিন্তা ও কর্মের সবচেয়ে বড় উপকারের দিক হলো যে, সকল প্রচেষ্টা ও কুরবানী সত্ত্বেও যদি সন্তান মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম হয় তাহলেও সে মা লজ্জিত হন না। তিনি নিরাশও হন না এবং তার কাজেও ভাটা পড়ে না। বরং এ আস্থায় তিনি সবসময় বলীয়ান থাকেন যে, দুনিয়ায় যদি সন্তান তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থও হয় তবুও তিনি আল্লাহর নিকট যে বদলা ও প্রতিদানের প্রত্যাশী তা তিনি পূরণ করবেন। কেননা আল্লাহ কখনো বান্দাহর কাজের প্রতিদান নষ্ট করেন না। তিনি বড়ো শক্তিশালী। তিনি বান্দাহর সুন্দর কাজের পুরোপুরি প্রতিদান দেন এবং কখনো বান্দাহকে প্রতিদান থেকে মাহরুম করেন না।

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا الدهر ٢٢ :

“এটা তোমাদের জন্য (তোমাদের প্রচেষ্টার) প্রতিদান এবং তোমাদের মেহমান এবং প্রচেষ্টা (আল্লাহর নিকট) কবুল হয় (বেকার হয়ে যায় না)।"-সূরা আদ দাহর: ২২

আল্লাহর কুদরাতের অবস্থা হলো তিনি বান্দাহর নেক আমলে নিজের ফযিলত আরো বৃদ্ধি করে দেন এবং প্রতিদান ও পুরস্কারকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে বান্দাহকে দান করেন। বান্দাহর আমলে যদি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয় তবুও তিনি প্রতিদানে কমতি না করে ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে দেন এবং নিজের ফযিলতের মাধ্যমে প্রতিদান বৃদ্ধি করেন।

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْلَهُ فِيهَا حُسْنًا ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ - الشورى٢٣ :
"যে কেউ কল্যাণময় কাজ করতে চাইবে আমরা তার জন্য এ কল্যাণে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিবো। নিসন্দেহে আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল ও মূল্যদানকারী।"-সূরা আশ শূরা: ২৩

সন্তান প্রতিপালনের অর্থ-দুটি দায়িত্ব
সন্তান প্রতিপালনে মাতা-পিতার দায়িত্ব সমান এবং উভয়ে মিলেমিশে দায়িত্ব পালন করে থাকে। সন্তান প্রতিপালনের অর্থ হলো দু ধরনের দায়িত্ব পালন করা।

এক: শিশু লালন-পালনের খিদমত।

দুই: শিশু প্রতিপালনে খরচের মাল প্রদান।

প্রথম দায়িত্বের অর্থ হলো শিশুদের প্রবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তাদের হিফাযত ও তত্ত্বাবধান করা। তাদের স্বাস্থ্য এবং আরামের ব্যবস্থা করা। যতদিন পর্যন্ত তারা খানাপিনার যোগ্য না হবে ততদিন তাদের এ খিদমত করতে হবে। মাতা শিশুকে নিজের দুধ খাওয়াবে এবং তত্ত্বাবধান করবে। দুধ ছাড়ানোর পরও বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তার তত্ত্বাবধান, শারীরিক ও নৈতিক প্রয়োজনীয়তার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। যাতে সে লালিত-পালিত হয়ে মানবীয় দায়িত্বানুভূতি লাভে সক্ষম হয় এবং তার পালনের যোগ্য হয়।

দ্বিতীয় দায়িত্বের অর্থ হলো, ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সন্তানের সকল খরচ বহন করতে হবে। তার খানাপিনা, পরিধান এবং বাসস্থানের সকল ব্যায় ও তার খিদমত, শরীর স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সকল ব্যয় বহন করতে হবে।
সুন্দর আচরণঃ সন্তানের তৃতীয় হক বা অধিকার হলো তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, তাদের সাথে স্নেহের পরশে মেলামেশা করা, তাদের আরাম-আয়েশের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা, তাদেরকে খুশী রাখার চেষ্টা করা এবং এমন আচরণ না করা যাতে তাদের আবেগ

আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাদের মন ভেঙ্গে না যায়, তারা নিরাশ না হয়ে পড়ে অথবা তাদের অহমবোধ ও আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে।

আপনার অধীনের আপনার প্রিয় শিশু সন্তান আপনার দিকে স্নেহ প্রাপ্তির দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এটা আপনার জন্য আল্লাহর পুরস্কার। এ পুরস্কারের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করুন এবং তার পুরস্কারের অমর্যাদা করবেন না। সন্তানদের মর্যাদা দিন এবং তাদের সাথে সে আচরণ করুন যার তারা যোগ্য।

সন্তান আল্লাহর আমানত। এ আমানত রক্ষা বা হিফাজত করুন এবং নিজের নাদানী ও খারাপ ব্যবহারের মাধ্যমে এ আমানতকেই নষ্ট করবেন না। সন্তানদের সাথে এমন আচরণ করুন যাতে তারা যোগ্য হয়ে দুনিয়ার জন্য আশীর্বাদ প্রমাণিত হয় এবং আপনার মান-মর্যাদা, সুনাম ও পরকালের মুক্তির পাথেয় হয়।

অসদাচরণের ভয়ংকর পরিণাম

সন্তানের সাথে আপনার আচরণ যদি ভালো না হয়, তাহলে এটা নিজের সাথে, সন্তানের সাথে এবং সমাজের সাথে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কথায় কথায় রাগ করা, চেঁচানো, ভয় দেখানো, গালমন্দ করা, অকাল কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা, তাদের নির্বুদ্ধিতায় অস্থির হয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, গালি দেয়া, তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা, তাদেরকে অহেতুক খেলাধুলা ও হাসা-হাসির সুযোগ না দেয়াই হলো সন্তানের সাথে অসদাচরণ। এ অসদাচরণের পরিণতি খুবই খারাপ এবং খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে। এ ভয়াবহ পরিণতি সন্তান, মাতা-পিতা ও সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়।

প্রথম বয়সে সন্তান যখন বুদ্ধিহীন, দুর্বল এবং অসহায় থাকে তখন সে আপনার মুহাব্বাত ও মেহেরবানীর অধিকারী থাকে। তখন সে আপনার স্নেহ, হামদরদী, সাহায্য ও পথপ্রদর্শন চায়। কিন্তু আপনার অধীন থেকে সে যদি এ তিনটি নেয়ামত না পেয়ে শুধুমাত্র ক্রোধ ও কাঠিন্যই পায় তাহলে সে প্রকৃতিগতভাবেই আপনার প্রতি নিরাশ হবে। আপনার নিকট থেকে দূরে থাকার ও গৃহ থেকে পলায়নের চেষ্টা করবে এবং যেখানেই সে এ তিন নেয়ামতের বিচ্ছুরণ দেখতে পাবে সেখানেই সে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হবে। শিশুরা আসল ও মেকি ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। সমাজের খারাপ প্রকৃতির মানুষ এ ধরনের শিশুদেরকে পথভ্রষ্ট করতে এবং চক্রান্তের

জালে আবদ্ধ করার সুযোগ পায়। আর এসব নাদান সন্তান ধীরে ধীরে সমাজের জন্য হয়ে উঠে বিষীষিকাময় এবং বড়ো বড়ো অপরাধ সংঘটন করতে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে এসব শিশু খারাপ মানুষের খারাপ শিকার থেকে যদি পরিত্রাণও পায় তাহলেও তারা মাতা-পিতার স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকে। মাতা-পিতার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক হয় না। মাতা-পিতার খারাপ ও দুর্ব্যবহারের পরিণামে শিশুদের অন্তরে মাতা-পিতার জন্য সে পবিত্র আবেগই সৃষ্টি হয় না যা সৌভাগ্যবান সন্তানের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মাতা-পিতা সারা জীবন ধরে তাদের নাফরমানী ও অযোগ্যতার জন্য ক্রন্দন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে বিদ্রোহী বানানোর ব্যাপারে সবচেয়ে গভীর প্রভাব হিসেবে কাজ করে তাদের অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার। আর মাতা-পিতা এজন্য সন্তানদের ঘাড়েই সকল দোষ চাপায়। কিন্তু জে নে রাখা ভালো যে, এ অবস্থায় সন্তানের চেয়ে মাতা-পিতার অপরাধ কোনো অংশেই কম নয়।

সন্তানের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ-

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও এমন নেই যে, যা তাঁর স্ত্রীরা, তাঁর সন্তানরা এবং সাহাবায়ে কিরামরা স্মরণ রাখেননি। এ সকল কিছুই চরিত ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে। এমনকি তাঁর একান্ত পারিবারিক এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সামান্য সামান্য ঘটনাও লোকজন মনে রেখেছে। একে অপরের নিকট বর্ণনা করেছে এবং তা হাদীস ও সিরাত গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু একথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো পবিত্র জীবনে এমন ঘটনা একটিও পাওয়া যাবে না যে, তিনি নিজের কোনো সন্তানকে মেরেছেন কেটেছেন, নরম-গরম কিছু বলেছেন অথবা কোনো ধরনের কঠোর আচরণ করেছেন। মুহাব্বাত, স্নেহ, মেহেরবানী, নরমী, রহম এবং সুন্দর আচরণের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কোনো সন্তানের সাথে তাঁর কঠোর আচরণের একটি ঘটনাও নেই। সন্তানের প্রতি তো মানুষের অসাধারণ ভালোবাসা থাকে এবং মেজাজ বিরোধী তাদের অনেক ব্যাপারই মানুষ বরদাশত করে নেয়। কিন্তু এখানে তো অবস্থা ভিন্ন ধরনের। একজন খাদেম দশ দশটি বছর তাঁর নিকট অবস্থান করে। আর

তিনি একটি বারের জন্যও তাকে একথা বলেননি যে, “উহ্, এটা কি হচ্ছে?” হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “প্রায় দশ বছর আমি মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে ছিলাম এবং সে সময় আমি ছিলাম কিশোর। এজন্য আমার সব কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্জী মুতাবেক হতো না (এবং হতেও পারে না, দশ-বারো বছরের বালকের আর কিইবা বুদ্ধি থাকতে পারে!) কিন্তু দশ বছরের সে পুরো সময়ে তিনি কখনো আমাকে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি এবং কখনো তিনি একথা, বলেননি যে, এটা কেন করেছ এবং এটা কেন করোনি।"
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর আচরণ এবং ব্যবহারের চিত্র এভাবে এঁকেছেন, "তিনি কখনো কোনো দাসকে, কোনো দাসীকে, কোনো মহিলাকে কোনো পশুকে নিজের হাতে মারেননি এবং যখনই তিনি ঘরে আসতেন তখন অত্যন্ত খুশি ও হাসি এবং মুচকি হাসি দিয়ে আসতেন।

কন্যার সাথে ভালো আচরণ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কন্যার ব্যাপারে বলতেন: "ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমার শরীরের একটি অংশ। যে তাকে নাখোশ করবে সে আমাকে নাখোশ করবে।"-বুখারী

বিয়ের পর যখনই হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন তখনই তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাতেন। তাঁর কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বাতেন। -আবু দাউদ

যদি কখনো হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দুঃখিত দেখতেন তখন স্বয়ং দুঃখিত হয়ে পড়তেন। একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে অত্যন্ত হাসি খুশী অবস্থায় বের হয়ে এলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি যখন কন্যার ঘরে ঢুকলেন তখন ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং যখন ঘর থেকে বের হয়ে এলেন তখন হাসি খুশী অবস্থায় বের হয়ে এলেন ব্যাপার কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি উভয়ের পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করে দিয়েছি। তারা উভয়েই আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

মদীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে অবস্থান করছিলেন। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহ তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে বেশ দূরে ছিলো। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যার গৃহে তাশরীফ নিলেন। কথায় কথায় বললেন, বেটি! তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছ। আমি তোমাকে নিজের নিকটে কোনো বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই।

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আব্বাজান! হারিস বিন নুমানের কয়েকটি বাড়ী আছে। আপনি যদি তাঁকে বলেন, তাহলে তিনি কোনো বাড়ী অবশ্যই দিয়ে দেবেন। আব্বাজান! আপনি তাঁকে বলুন! প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বেটি! তাঁকে বলতে আমি লজ্জা পাই।
কোনোভাবে একথা হারিস বিন নুমান জানতে পেলেন। তিনি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শুনেছি যে, আপনি আপনার কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিজের নিকট কোনো বাড়ীতে আনতে চান। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক! আমার সকল বাড়ী আপনার নিকট হাজির করলাম। যে বাড়ীতে ইচ্ছা, আপনি খুশীর সাথে তাঁকে নিয়ে আসুন। আল্লাহর কসম! যে জিনিসই আপনি আমার নিকট থেকে নেবেন, তা আপনার নিকট থাকা আমার নিকট থাকার চেয়ে আমি বেশী পসন্দ করি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন এবং তোমার উপর রহমত নাযিল করুন। অতপর তিনি প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিয়ে হারিস বিন নুমানের একটি বাড়ীতে নিজের নিকটে নিয়ে এলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই সফরে যেতেন তখন সর্বশেষ ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে তাশরীফ রাখতেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করে সফরে রওয়ানা হয়ে যেতেন। এমনিভাবে তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন

তখন মসজিদে নফল নামায থেকে ফারিগ হয়ে সর্বপ্রথম হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট তাশরীফ নিতেন।

নাতীদেরকেও গভীরভাবে ভালোবাসতেন। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট যখনই যেতেন তখনই বলতেন, ফাতেমা! আমার শিশুদেরকে আনো। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার পুত্রদেরকে তাঁর নিকট আনতেন। তিনি তাঁদেরকে শুঁকতেন এবং বুকের সাথে চেপে ধরতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যার নাম ছিলো হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি সবার বড়ো ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিলো খালাতো ভাই আবুল আছের সাথে। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লা আনহা বিয়েতে তাঁকে ইয়েমেনী আকিক পাথরের একটি মূল্যবান হার দিয়েছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। তাঁর স্বামী তখনো ঈমান আনেননি। বরং কাফেরদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন। নিজের মুক্তির জন্য তিনি বাড়ীতে ফিদইয়ার অর্থ প্রেরণের কথা বলে পাঠালেন। বস্তুত হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা সে হার প্রেরণ করেছিলেন। হার তার আম্মা বিয়েতে দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজের কন্যার এ হার দেখলেন তখন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। অতপর তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা সম্মত হলে এ হার যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ফিরিয়ে দিতে পার এবং তাঁর স্বামীকেও মুক্তি দিতে পার। সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আবেদন হৃষ্টচিত্তে মঞ্জুর করলেন। আবুল আছকে মুক্ত করে দেয়া হলো। এবং তাঁর স্ত্রীর হারও তার হাওয়ালা করা হলো। কিন্তু শর্ত দেয়া হলো যে, সে মক্কা গিয়ে হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দেবে।

সুতরাং হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা পিতার নিকট এসে গেলেন। কিছুদিন পর আবুল আছও মদীনা এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবুল আছের ইসলাম গ্রহণের পর হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা সোয়া বছর জীবিত ছিলেন এবং ৮ম হিজরীতে এ নশ্বর জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজের পবিত্র হাতে তাঁকে কবরে নামান। কবরে নামানোর সময় তিনি অত্যন্ত শোকাতুর এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। অতপর আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, পরওয়ারদিগার! এ বড়ো দুর্বল ছিল।

পরওয়ারদিগার তুমি তার মুশকিলকে আসান করো এবং তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। -উসুদুল গাব্বাহ

ভালো নাম রাখাঃ লোকজন সন্তানকে ভালো নামে ডাকুক, এটাই মাতা-পিতার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে। ভালো নামে ডাকার ফলে একদিকে যেমন শিশু খুশী হয়। অন্যদিকে যিনি ডাকেন তার অন্তরেও তার জন্য সুন্দর ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটাতো তখনই হতে পারে যখন আপনি আপনার সন্তানের ভালো নাম রাখবেন। আপনার উপর আপনার প্রিয় সন্তানের অধিকার হলো আপনি তার সুন্দর ও পবিত্র নাম রাখবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতকে ভালো এবং পবিত্র নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী এবং মহিলা সাহাবীরা যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজের সন্তানের নাম রাখার জন্য আবেদন জানাতেন তখনই তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও উদ্দেশ্যপূর্ণ নাম প্রস্তাব করতেন। কারোর নিকট তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে যদি অর্থহীন এবং অপসন্দনীয় নাম বলতো তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপসন্দ করতেন এবং তাকে নিজের কোনো কাজ করতে দিতেন না। পক্ষান্তরে সুন্দর ও পবিত্র নাম উচ্চারণ করলে তিনি পসন্দ করতেন। তার জন্য দোয়া করতেন এবং নিজের কাজ করতে দিতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কোনো প্রয়োজনে বাইরে বেরুলে তিনি 'ওয়া নাজিহ' অথবা 'ইয়া রাশেদ'-এর মতো বাক্য শুনতে ভালোবাসতেন। যখন কাউকে কোনো স্থানের দায়িত্বশীল বানিয়ে প্রেরণ করতেন তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সে তার নাম বললে, তাঁর পসন্দ হলে খুব খুশী হতেন এবং খুশীর আলামত তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। যদি তার নাম তিনি অপসন্দ করতেন তাহলে তার প্রভাব চেহারায় ফুটে উঠতো। যখন কোনো বস্তিতে প্রবেশ করতেন তখন সে বস্তির নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি সে বস্তির নাম তাঁর পসন্দ হতো তাহলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। অধিকাংশ সময় এটাও হতো যে তিনি অপসন্দনীয় নাম পরিবর্তন করে দিতেন। খারাপ নাম তিনি কোনো বস্তুর জন্যই সহ্য করতে পারতেন না। মানুষরা একটি স্থানের নাম হুজরাহ অর্থাৎ বাঁজা বা বান্ধা বলে ডাকতো। তিনি সে স্থানের নাম খুজরাহ অর্থাৎ চির-সবুজ ও শস্য-শ্যামল রেখে দিলেন। একটি ঘাঁটিকে গুমরাহির ঘাঁটি বলা হতো। তিনি তার নাম হেদায়াতের ঘাঁটি রাখলেন। এমনিভাবে তিনি অনেক পুরুষ এবং মহিলার নামও পরিবর্তন করে দেন। যে ব্যক্তি তাঁর পরিবর্তিত নামের পরিবর্তে

পুরাতন নাম সম্পর্কেই পীড়াপীড়ি করতো তাহলে সে তার পুরাতন নামের খারাপ প্রভাব নিজের ব্যক্তিত্বের উপরও অনুভব করতো এবং বংশধরদের উপর তার খারাপ প্রভাব অবশিষ্ট থাকতো।

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসাঃ সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শনও তাদের একটি অধিকার। সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা দেখানো একটি সহজাত ব্যাপার। আল্লাহ পাক প্রত্যেক মাতা-পিতার অন্তরে এ সহজাত প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। মাতা-পিতার অন্তরে সন্তানের সীমাহীন ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি করে আল্লাহও মাতা-পিতার প্রতি অসামান্য ইহসান করেছেন। অন্যদিকে এটা সন্তানের প্রতিও ইহসান। সন্তানের প্রতি ইহসান এ কারণে যে, তাছাড়া সন্তানের লালন-পালন সম্ভবই নয়। বরং তা বেশীর ভাগই অসম্ভব ছিল। মানব শিশু অন্য সকল জন্তুর বাচ্চার তুলনায় সবচেয়ে বেশী অসহায়, মজবুর, দুর্বল এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মাতা-পিতার অন্তরে যদি তার জন্য স্নেহ ও ভালোবাসার সীমাহীন আবেগ না হতো তাহলে তার লালন-পালনই হতো না। মাতা-পিতার নজিরবিহীন স্নেহ-ভালোবাসা এবং অসাধারণ ত্যাগ কুরবানীর বদৌলতেই সে বড়ো হয়ে উঠে এবং যোগ্য হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণঃ দৈহিক ও শারীরিক প্রবৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণও সন্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কিন্তু এ অধিকার পূরণ সত্ত্বেও আপনি যদি তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, শিষ্টাচার ও সভ্যতা থেকে গাফেল থাকেন তাহলে আপনি বড়ো ধরনের অন্যায় করছেন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া আপনার সন্তান সন্তান হতে পারে না। যে সকল পবিত্র আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে সন্তান কামনা করেন এবং যেসব উত্তম আশা পূরণের লক্ষ্যে দিন-রাত তাদের লালন-পালনে সময় ব্যয় করেন তা তখনই পূরণ হতে পারে যখন আপনি সন্তানের দীনি শিক্ষা এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের হক আদায় করবেন।

সন্তানকে নেক ও ভাগ্যবান করে গড়ে তোলা একদিকে যেমন আপনার দীনি দায়িত্ব। তেমনি সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনও তাদের অধিকারভুক্ত ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের অধিকারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, আপনি অত্যন্ত হিকমত, চিন্তা-ভাবনা, ধৈর্য, কর্তব্য সচেতনতা, উদারতা, রুচিশীলতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও একাগ্রতার সাথে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। সন্তানের এ অধিকার পূরণ

করেই আপনি আশা করতে পারেন যে, আপনার সন্তান আপনার জন্য শান্তির কারণ, সমাজের জন্য রহমাতের মাধ্যম, মিল্লাতের জন্য গৌরবের আধার এবং দীনের সম্পদ হতে পারে। সন্তান লালন-পালনে প্রভূত পরিমাণ জীবনী শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ের পরও যদি আপনি তাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে গাফলতি প্রদর্শন করেন তাহলে আপনি সাংঘাতিক ধরনের সামাজিক অপরাধ করছেন। এ অপরাধের পরিণামফল অত্যন্ত বিষময়।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ শুরুর সময়ঃ

শিকাগোর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ফ্রান্সিস উইলিণ্ডার পার্কার একবার শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে একজন মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ

"আমি আমার শিশুর শিক্ষা কখন থেকে শুরু করবো?"

উইলিণ্ডার পার্কার বললেন, "আপনার শিশু কবে জন্ম নেবে?"

"জন্ম নেবে?" মহিলাটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো, "জনাব, তার বয়সতো পাঁচ বছর হয়ে গেছে।"

"সর্বনাশ হয়ে গেছে। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আর ওদিকে মূল্যবান পাঁচটি বছর শেষ হয়ে গেছে।"

এটা কোনো গল্প নয়। বরং বাস্তব ব্যাপার। শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তার শিক্ষা-দীক্ষার চিন্তা করা উচিত। প্রথম কয়েক বছর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সাধারণত এ প্রাথমিক বছরগুলোকে নিশ্চিন্তায় নষ্ট করা হয়। ভূমিষ্ঠ হতেই শিশুর কানে আযান এবং ইকামাত প্রদানের হিকমত এটাই যে, প্রথম থেকেই আল্লাহর আজমত এবং মহানত্ব তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করুক। আল্লামা কাউয়েম রাহমাতুল্লাহ আলাই স্বলিখিত পুস্তক "তোহফাতুল ওয়াদুদে" বলেছেন:

"এর অর্থ হলো, মানুষের কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর আজমত ও শ্রেষ্ঠত্বের আওয়াজ পৌছুক। বালেগ হবার পর যে শাহাদাত প্রদান করে ইসলামে প্রবেশ করবে, তার তালকিন জন্মের দিন থেকেই করা দরকার। যেমন মৃত্যুর সময় তাকে কালেমায়ে তাওহীদের তালকিন দেয়া হয়। আযান এবং ইকামাতের দ্বিতীয় উপকার হলো, শয়তান ঘাপটি মেরে বসে থেকে জন্ম হতেই মানুষকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করতে চায়। এ সময় আযান শুনতেই সে পালিয়ে যায় এবং শয়তানের দাওয়াতের পূর্বেই শিশুকে ইসলাম এবং আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত দেয়া হয়।

শিশু যদিও জীবনের প্রথম দিনগুলোতে কথা বলতে পারে না, তবুও অনুভব করতে পারে এবং শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকে। সে মা'র চাল-চলন থেকে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে। এজন্য এ সময়েও শিশুর সামনে কোনো খারাপ কথা এবং অভদ্র আচরণ করা যাবে না। ভালো ভালো শব্দ এবং ভালো ভালো বোল দিয়ে তাকে মানুষ করতে হবে। তার পাশে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

যখন শিশুর কথা ফুটতে থাকে তখন তাকে কালেমা শিক্ষা এবং প্রথম থেকেই তাওহীদের শিক্ষা এবং আল্লাহর গুণাবলীর সঠিক ধারণা তার মগজে ঢোকাতে হবে। হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশে যখনই কোনো শিশু কথা বলতে শিখতো তখনই তিনি তাকে সূরায়ে আল ফুরকানের এ আয়াত শিক্ষা দিতেন:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا - الفرقان٢ :

"যিনি যমীন ও আসমানসমূহের বাদশাহীর মালিক, যিনি কাউকেও পুত্র বানিয়ে লন নাই, যাঁর সাথে বাদশাহীতে কেউই শরীক নেই, যিনি সব জিনিসই সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার একটি তাকদীর নির্দিষ্ট করেছেন।"-সূরা আল ফুরকান: ২

অন্য এক হাদীসে এসেছে, যখন শিশু কথা বলতে থাকে তখন তাকে কালেমা শিক্ষা দান করো:

إِذَا أَفْصَحَ أَوْلَادُكُمْ فَعَلِمُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - ابن سنى

"যখন তোমাদের শিশুরা কথা বলতে শিখে তখন তাদেরকে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিক্ষা দাও।"

হাদীসের অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিক্ষা দাও। এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কালেমায়ে তাওহীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মর্মার্থ হলো, তাদেরকে সম্পূর্ণ কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শিক্ষা দান করো।

কুরআন, দোয়া এবং নামায শিক্ষাদানঃ শিশুর যখন কিছু বুদ্ধি বাড়ে এবং হুশিয়ার হয়ে উঠে তখনই তাদেরকে নামাযের বিষয়সমূহ ইয়াদ করাতে হবে। নামাযের কিরআতের ব্যাপারে ছোট বেলা থেকেই শিক্ষাদান করা উচিত এবং কিরআত যাতে সহীহ এবং শুদ্ধ হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দেয়া দরকার। কারণ ছোট বেলা ভুল কিরাআত শিক্ষা পেলে সারা জীবনই কিরাআত ভুল থেকে যায়। এ বয়সেই পবিত্র কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ মুখস্ত বা হিফজ করাতে হবে এবং কিছু অংশের অর্থ ও মর্মার্থ সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। এতে প্রথম থেকেই কুরআন পাক সম্পর্কে তাদের এ ধারণা সৃষ্টি হবে যে, এ কিতাব ভালোভাবে বুঝে পড়তে হবে।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পঠিত সুন্নাত দোয়াসমূহও তাদেরকে ইয়াদ করাতে হবে। নিসন্দেহে পারিবারিক কাজ-কর্মে আপনি দিন-রাত ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আপনার এ দায়িত্ব অন্যান্যদের দায়িত্ব থেকে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানকে আপনি একটি সুন্দর বৃত্তি হিসেবে বানিয়ে নিন এবং অন্তর দিয়ে এ দায়িত্ব পালন করুন। শিশুদের বয়স ও মেধার প্রতি দৃষ্টি রেখে কতিপয় দোয়া তাদেরকে অবশ্যই শেখাতে হবে। যেমন ঘুম যাওয়া ও ঘুম থেকে উঠার দোয়া, খানা-পিনার দোয়া, নতুন কাপড় পরিধানের এবং নতুন ফল খাওয়ার দোয়া, হাঁচির দোয়া এবং তার জবাব ও নতুন চাঁদ দেখার দোয়া ইত্যাদি। এসব দোয়া মস্তিষ্ক তৈরি এবং দীনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে অত্যন্ত কার্যকর হয়ে থাকে। মিলযুক্ত শব্দ ও কবিতা শিশুরা খুব উৎসাহের সাথে পাঠ করে থাকে এবং তা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মুখস্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করুন এবং তাদের এ আগ্রহ পূরণার্থে সুন্দর ও যথোপযুক্ত কবিতাংশ নির্বাচন করে দিন। যেমনঃ

مَا فِي قَلْبِي غَيْرَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حَسْبِي رَبِّي جَلَّ اللَّهُ نُورِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

শিশুদের এ উৎসাহ পূরণে আপনি যদি ব্যর্থ হন তাহলে তারা অবাঞ্ছিত কবিতা মুখস্ত করে তা বারবার আবৃত্তি করতে থাকবে। আর আপনি জানেন যে, নৈতিকতা রক্ষার জন্য ভাষার সংরক্ষণ কতখানি প্রয়োজন।

ইসলামী আদব শিক্ষা দানঃ আদব ও সভ্যতা এবং জীবনের শিষ্টাচার শিক্ষার বয়সও এটাই। শিশুদেরকে অবুঝ বলে পরওয়া না করা এক ধরনের বিরাট আহাম্মকি। শৈশবকালে আপনি যে শিষ্টাচার শিখিয়ে দেবেন এবং যে অভ্যাস গড়ে তুলবেন তা তার সারা জীবনেই প্রভাব ফেলবে। শৈশবকাল যেসব ভালো অথবা খারাপ অভ্যাস গড়ে উঠে তা খুব কমই দূর হয়। এ বয়সে শিশুদের প্রতি বেশী বেশী দৃষ্টিদান খুবই প্রয়োজন। মা'র দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
জীবনের প্রথম দিকে সামান্য অবহেলা চিরকালের জন্য লজ্জা ও পেরেশানীর কারণ হতে পারে।

একটি পরিকল্পনার অধীন হিকমত, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সাথে শিশুদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। খানা-পিনা, উঠা-বসা, ঘুম ও জাগরণের আদব শিক্ষা দিন। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি আদব, মসজিদ-মাদ্রাসার আদবের কথা বলুন। পাক-পবিত্রতার আদব, স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার আদব, চলা-ফেরা এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে উঠা-বসার আদব, গৃহের এবং নিজের জিনিসসমূহকে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে ব্যবহারের নিয়ম শিক্ষা দিন এবং একটি সভ্য ও পবিত্র জীবন পরিচালনার জন্য অব্যাহতভাবে আপনি তার অভিভাবকত্ব করুন। একবার শুধু কোনো ভালো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই যথেষ্ট নয় বরং প্রশিক্ষণের দাবী হলো যে, আপনি সে ব্যাপারে অব্যাহতভাবে দৃষ্টি রাখুন এবং বারবার ভুল সত্ত্বেও বিরক্ত হবেন না। ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে এবং অন্তর দিয়ে তাদেরকে শুধরে দিতে থাকুন এবং সামান্যতম ভুলকেও তুচ্ছ মনে করবেন না। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাদকার একটি খেজুর উঠিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আরে থু মেরে তা ফেলে দাও। তুমি কি জানো না যে, আমাদের জন্য সাদকা খাওয়া ঠিক নয়।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবু সালমা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লালন-পালন করছিলেন। তিনি নিজের কাহিনী বর্ণনা করেছেন:

كُنتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ ! سَمِّ اللَّهَ

تَعَالَى وَكُلُّ بِيَمِينِكَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدُ - متفق عليه

"আমি তখন ছোট ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে থাকতাম। খাবার সময় আমার হাত প্লেটের চারপাশে ঘুরছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, পুত্র! বিস্মিল্লাহ্ পড়ে ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের দিক থেকে খাও। ব্যাস, এরপর থেকে এটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হলো।"
নামাযের তাকিদঃ নামায এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যা দীনের সাথে মানুষকে সম্পর্কযুক্ত রাখে। নামায় দীনকে হেফাজতও করে। আবার দীনের প্রতি আকর্ষণও করে থাকে। দীনদার জীবন অতিবাহিত করার জন্য মানুষকে প্রস্তুতও করে। শুরু থেকেই শিশুদেরকে নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে অহেতুক স্নেহ-প্রীতি এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী নরম প্রদর্শন খুবই ক্ষতিকারক।

এশার নামায পড়া ব্যতিরেকে শিশুদেরকে শুতে দিবেন না। শুয়ে পড়লেও উঠিয়ে নামায পড়ান। ফযরের নামাযের জন্য প্রথম ওয়াক্তে ঘুম থেকে জাগান এবং সকালে উঠার অভ্যাস করান। আল্লাহর নির্দেশ হলো:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا - - طه١٣٢ :

"নিজের পরিবার-পরিজনকে নামাযের তাকিদ দাও. এবং নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাকো।"-সূরা ত্বহা : ১৩২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ-

"যখন তার বয়স সাত বছর হয় তখন সন্তানকে নামায পড়ার তাকিদ দাও। যখন তার বয়স দশ বছর হয়ে যায় তখন নামায পড়ার জন্য তার উপর কঠোরতা আরোপ করো এবং এ বয়স হবার সাথে সাথে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"

এ সকল নির্দেশের অর্থ হলো, স্বয়ং আপনি নামাযের পাবন্দ থাকবেন এবং গৃহের পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করবেন যাতে শিশুরাও আগ্রহ সহকারে নামায পড়বে। আপনার কাজ এটাই প্রমাণ করবে যে, নামাযের প্রতি অবহেলা আপনি কোনোক্রমেই বরদাশত করবেন না।

পবিত্র কিসসা-কাহিনী শুনানোর ব্যবস্থা করা

শৈশবকালে শিশুরা কিসসা-কাহিনী শুনতে খুবই আগ্রহী হয়। তারা অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে কিসসা-কাহিনী শুনেও থাকে এবং প্রভাবিতও হয়। বরং কিসসার কতিপয় চরিত্র তো তাদেরকে প্রভাবিত করে যে, তারা স্বয়ং তা হবার চেষ্টায় লেগে যায়। শিশুদের এ মনস্তাত্ত্বিক গুণের ফায়দা নিন এবং আপনি তাদেরকে যেভাবে তৈরির আকাঙ্ক্ষা করেন, সে ধরনের কিসসা-কাহিনীই শুনান। শুধুমাত্র তাদের আগ্রহ পূরণের জন্য কিসসা শুনাবেন না। বরং কিসসাকে শিক্ষার উত্তম মাধ্যম মনে করে তার ব্যবস্থা করুন। নবীদের পবিত্র কাহিনী শুনান। সাহাবায়ে কিরামের উদ্যমপূর্ণ ঘটনাবলী শুনান। ইসলামের মুজাহিদদের বীরত্ব গাঁথা শুনান। যুদ্ধের ময়দানের কৃতিত্বের উল্লেখ করুন। এমনিভাবে ইসলামের জন্য তাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন।

জ্বীন-পরীর কাহিনী, ভূত-প্রেতের ঘটনা, যাদু-টোটকার কিসসা, দেও-দৈত্যের কাহিনী শিশুদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। তাদের খারাপ প্রভাবে শিশুদের মন-মগজ খারাপভাবে এক অজানা ভীতি তাদের অন্তর ও মস্তিষ্কে ছেয়ে থাকে। উচ্চতম শিক্ষা লাভ সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের সংশয়ে তারা ভোগে।

কিসসা-কাহিনী শোনার আগ্রহ শিশুদের সহজাত আগ্রহ। তাতে বাধা দানও ঠিক নয় আবার এ ব্যাপারে তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়াও অত্যন্ত কৌশল বা হিকমতের সাথে তাদেরকে এ ব্যাপারে সহ করুন এবং এ প্রয়োজন ও আগ্রহ এমনভাবে পূরণ করুন যাতে তাদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণদানে সফল হন।

সন্তানের বিয়েঃ

শিশু যেই যৌবনে পদার্পণ করে তখনই সে নতুন ধরনের চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা এবং পেরেশানীতে নিপতিত হয়। সন্তান যখন বয়সের এ পর্যায়ে উপনীত হয় তখন মাতা-পিতা নতুন ধরনের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেন। যখন ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করেন তখন ভয়-ভীতি ও সংশয় তাদের আরামকে নষ্ট করে দেয়। কখনো ভবিষ্যতের সুন্দর আশা-আকাঙ্ক্ষার চিন্তায় তাদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না। কখনো অমূলক পেরেশানী এবং কল্পনাপ্রসূত জটিলতায় অন্তর ছোট হয়ে যায়। কখনো দায়িত্বানুভূতি তাদেরকে উত্তেজিত করে এবং অবিলম্বে সন্তানের এ দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠে। সুন্দরী ও ভদ্র পুত্রবধূ গৃহে আনার আনন্দে তাদের অন্তর কখনো আত্মহারা হয়ে উঠে। কখনো কন্যার জন্য নেকবখত ও নেক চরিত্রের জীবন সাথী পাবার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করে থাকেন।

সন্তানকে বিয়ে দেয়া একদিকে যেমন সামাজিক কর্তব্য। তেমনি এটা মাতা-পিতারও আন্তরিক কামনা এবং ইসলামও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও হেদায়াত দিয়ে থাকে।

সন্তানের বিয়ে দেওয়া পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তবে এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সন্তানের মতামত, পছন্দ এবং অনুমতির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামে জোরপূর্বক বা সন্তানের অমতে বিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ইসলামী শরিয়তে বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী উভয়ের **স্পষ্ট সম্মতি বা অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক**। সন্তানের অমতে বা জোর করে বিয়ে দিলে সেই বিয়ে শরিয়ত অনুযায়ী বৈধ হয় না।

কন্যার ক্ষেত্রে: প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের অনুমতি ছাড়া তাকে বিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার পিতা-মাতার নেই। সে কুমারী হোক বা পূর্বে বিবাহিতা হোক।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "পূর্ব বিবাহিতা নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া তাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কুমারী নারীর অনুমতি (বা সম্মতি) গ্রহণ ছাড়া তাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না।" (সহীহ বুখারী: ৫১৩৬)

পুত্রের ক্ষেত্রে: ছেলের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তার অনিচ্ছায় কোনো মেয়ের সাথে তাকে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া যাবে না।
আর জোরপূর্বক বিয়ের সম্পর্ক বেশিরভাগ সময়ই বিচ্ছেদে পরিণত হয়।

সন্তানের পছন্দের গুরুত্ব

সন্তান যদি কোনো দ্বীনদার এবং চরিত্রবান পাত্র বা পাত্রীকে পছন্দ করে, তবে পিতা-মাতার উচিত শরিয়তসম্মত উপায়ে তা যাচাই করে দেখভাল করা। কোনো যৌক্তিক এবং শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া শুধু বংশমর্যাদা, সম্পদ বা জেদের বশে সন্তানের পছন্দকে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়।
সন্তান যাকে বিয়ে করবে, তার সাথে সারাজীবন সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবে কি না, তা বিবেচনার অধিকার সন্তানের রয়েছে।
কোনো মেয়ে যদি তার অভিভাবকের জোরপূর্বক করা বিয়েতে রাজি না হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অভিযোগ জানাতো, তবে তিনি সেই বিয়ে বাতিল করে দেওয়ার অধিকার মেয়েটিকে দিতেন (সহীহ বুখারী: ৫১৩৮)। এ থেকে প্রমাণিত হয় সন্তানের পছন্দের গুরুত্ব কতখানি।

ইসলামের হেদায়াত

ইসলাম একটি প্রাকৃতিক ধর্ম। এ ধর্ম প্রকৃতির দান পূরণ করে। সন্তান জওয়ান হতেই যথাযথ সম্পর্ক পাওয়া গেলেই আপনি তার বিয়ে দিতে চান। ইসলাম আপনার এ আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা দিয়ে থাকে। ইসলামেরও নির্দেশ হলো সন্তান জওয়ান হবার সাথে সাথে তার বিয়ে দেয়ায় বিলম্ব না করা। সঠিক সম্পর্ক পেতে অবশ্যই সময়ের প্রয়োজন। তবে ইসলামের নির্দেশের আলোকে সঠিক সম্পর্ক পাবার পরও অহেতুক বিলম্ব ও টালবাহানা করা কোনোক্রমেই ঠিক নয়। অনেক সময় এ অহেতুক বিলম্ব ও টালবাহানা খারাপ ফল হয়। মোটকথা, এ খারাপ ফলের দায়-দায়িত্ব মাতা-পিতা এড়াতে পারেন না।

বিলম্বে বিয়ের খারাপ পরিণাম

পুত্র হোক অথবা কন্যা যখনই সে জওয়ান হয়, তখনই তার যথাযথ সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা করা মাতা-পিতার অন্যতম গুরত্বপূর্ণ কর্তব্য। আর যখনই এ ধরনের সম্পর্ক

পাওয়া যাবে তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ের বাকডোরে বেঁধে দেয়া উচিত। বিয়ের ব্যাপারেত অহেতুক বিলম্ব করা অনেক সময় খুব লজ্জাকর পরিণাম ডেকে আনে। সমাজে মানুষ মুখ দেখানোর যোগ্য থাকে না। এ লজ্জা মাতা-পিতার জীবনে গ্লানিকর হয়ে উঠে। কিন্তু এর দায়-দায়িত্ব মাতা-পিতার উপরও বর্তায়। কেননা তারা সন্তানের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অলসতা দেখিয়ে থাকে অথবা কোনো শরয়ী ও যুক্তিপূর্ণ কারণ ছাড়া বিলম্ব করে। যৌবনের আবেগ বা উত্তেজনা প্রশমনের সঠিক স্থান না পেলে যুবকদের বিপথে পরিচালিত হবার সমূহ আশংকা থাকে। আর এ জন্যে আপনি খারাপ পরিবেশের দোহাই দিয়ে নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করবেন অথবা যুবকদের গালমন্দ দিয়ে নিজেদের অপরাধ হালকা করার নিষ্ফল চেষ্টা চালাবেন তা হতে পারে না। এ রোগের সঠিক চিকিৎসা হলো, আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুভব করুন এবং এ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হেদায়াত দিয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে পালন করুন। বিলম্বে বিয়ের পরিণাম শুধু উদ্ভূত খারাপ পরিস্থিতিই নয়, বরং ইসলামের পরিণাম দৃষ্টিতে আপনি গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمُهُ وَادَّبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُهُ وَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجُهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا اثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ - بيهقى

"আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেছেন তার কাজ হলো, তার ভালো নাম রাখা, তাকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিয়ে দিয়ে দেয়া। বালেগ হবার পর সে সন্তানের বিয়ে না দেয় এবং কোনো গুনাহতে লিপ্ত হয় তাহলে তার শাস্তি পিতার উপর আরোপিত হবে।"-বায়হাকী

অন্য এক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে, "যে ব্যক্তির কন্যার বয়স ১২ বছর হলো এবং সে তার বিয়ে দিলো না এবং সে কোনো খারাপ কাজ করে বসলো তাহলে তার সে খারাপ কাজের শাস্তি পিতার উপর আরোপিত হবে।"

যোগ্য সম্পর্কের সন্ধানঃ যোগ্য পাত্র বা পাত্রী না পাবার কারণেই সাধারণত বিয়েতে বিলম্ব ঘটে পুত্র অথবা কন্যার জন্য যোগ্য পাত্রী বা পাত্রের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের

চালানো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। বরং এ চিন্তা ও চেষ্টা আপনার জন্য ফরয। ইসলামী শিক্ষার দাবীও হলো যে, আপনি যথাযথ সম্পর্কের জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবেন।

ইসলাম আপনার নিকট এ দাবী কখনো করে না যে, যত খারাপ পাত্র-পাত্রীই আপনি পান তা চোখ বুজে গ্রহণ করবেন। এ প্রশ্নে আপনি কোনো চেষ্টা অথবা অনুসন্ধান চালাবেন না। বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সারা জীবনের ব্যাপার। দুনিয়ার ভাঙ্গা-গড়া পর্যন্তই তার প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে না বরং পরকালীন জীবনের উপরও তার প্রভাব পড়তে পারে। অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর বিষয়। জীবন সাথী নির্বাচনে চিন্তা-ভাবনা করা অত্যাবশ্যক।

এটা শুধু চিন্তার বিষয় যে, আপনার চেষ্টা-চরিত্র এ চিন্তা ইসলামের আলোকে হচ্ছে কি-না। জীবন সাথী নির্বাচনের যে মাপকাঠি ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাই আপনাকে অবলম্বন করতে হবে। নিজের সন্তানের জীবন সাথী নির্বাচনে এসব মৌলক বিষয় সামনে রাখুন। চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন যে, দীনে যেসব বিষয়ে কোনো গুরুত্ব নেই সেসব বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বিলম্ব ঘটাচ্ছেন।

জীবন সঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি

জীবন সাথী নির্বাচনে সাধারণত পাঁচটি জিনিস সামনে রাখা হয়ে থাকে।

এক: ধন-সম্পদ

দুই: বংশ আভিজাত্য

তিন: সুশ্রী ও সৌন্দর্য

চার: দীন ও আখলাক এবং'

পাঁচ: শিক্ষা।

এটা নিসন্দেহে বলা যায় যে, এ পাঁচটি বস্তু স্ব স্ব স্থানে গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে ধন-সম্পদের গুরুত্ব কে অস্বীকার করতে পারে। বংশ আভিজাত্যও অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করার বিষয় নয়।

জীবন সঙ্গীনি নির্বাচনে সৌন্দর্য ও সুশ্রী হওয়াটাও মৌলিক গুরুত্বের দাবীদার। তা পাত্রী নির্বাচনে বিশেষ করে এ বিষয়টি সিদ্ধান্তমূলক হয়ে থাকে। এ ব্যাপারটিও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আল্লাহই মানুষকে রুচি এবং সৌন্দর্য প্রদান করেছেন এবং রূপতো পসন্দ করারই বিষয়।

শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজন স্বীকৃত সত্য। বর্তমান যুগে সম্বন্ধ স্থাপনে, শিক্ষার এবং ডিগ্রীকে তো বিশেষভাবে খেয়ালে রাখা হয়। এটাও ঠিক যে উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে এবং সভ্যতায় সুসজ্জিত করে। উচ্চ শিক্ষা মান-ইজ্জত বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। সচ্ছল জীবন এবং সমাজে মান-সম্মানের কারণ হয়।

রইলো দীন ও আখলাকের কথা। এটাতো স্পষ্ট ব্যাপার যে, মুসলমানের নিকট তার গুরুত্ব ও মূল্য থাকবেই। প্রস্তাবিত ব্যক্তির মধ্যে মুসলমান মাতা-পিতা সবকিছু দেখবেন অথচ দীন ও আখলাকের ব্যাপারটি উপেক্ষা করবেন অথবা কোনো গুরুত্বই দেবেন না, তা হতে পারে না।

আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা যদি এ হয় যে, আপনার কন্যা অথবা পুত্রকে এমন জীবন সাথী এনে দেবেন যে, এ পাঁচ গুণে গুণান্বিত। আপনার এ আকাঙ্ক্ষা শুভ। আপনার আশাও ঠিক এবং আপনার প্রচেষ্টাও সঠিক। কোন্ পিতা-মাতা চায় না যে, তার কলিজার টুকরা এসব গুণে গুণান্বিত জীবন সাথী লাভ করুক?

ইসলাম আপনার এ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চেতনার কখনো অবমূল্যায়ন করে না। ইসলাম আপনার এ আবেগের মর্যাদা দেয়।

সকল গুণে বিভূষিত দম্পতি যদি পান তাহলে তা হবে আল্লাহর বিশেষ অবদান। সাধারণত প্রত্যেক সম্পর্ক স্থাপনে সকল গুণ এক সাথে পাওয়া খুবই দুষ্কর ব্যাপার। কারোর মধ্যে কিছু গুণ পাওয়া গেলে আবার কিছু মন্দও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে আপনার পরীক্ষা হলো, নির্বাচনে আপনাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণকে সামনে রাখতে হবে এবং ইসলাম এ গুণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হলো, পাত্র অথবা পাত্রী নির্বাচনের সময় সর্বপ্রথম আপনাকে দীন ও আখলাকের বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিতে হবে। দীন ও আখলাকের সাথে অন্য চার বস্তুর মধ্যে কোনোটি যদি পেয়ে যান তাহলে আপনাকে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। এরপর আর আপনি বিয়েতে অহেতুক বিলম্ব করবেন না। হ্যাঁ, সে আত্মীয়তা অথবা সম্পর্ক আপনার জন্য গ্রহণযোহ্য হতে পারে না, যে সম্পর্কে সকল গুণই রয়েছে কিন্তু দীন ও আখলাক নেই। মুসলমান মাতা-পিতার প্রথম দেখার বস্তু হলো দীন ও আখলাক। যার মধ্যে তা নেই অন্যান্য বিষয়ে উদাহরণতুল্য হলেও আপনার কলিজার টুকরার জীবন সাথী হতে পারে না। তাঁকে আপনি ঘরের বধু অথবা জামাই বানানোর চিন্তা করতে পারেন না। অন্যান্য জিনিসের ক্ষতিপূরণ তো দীন এবং আখলাক দিয়ে হতে পারে অথবা এভাবে বলা যায় যে, দীন ও আখলাকের কারণে অন্যান্য দুর্বলতাতো সহ্য করা যায় কিন্তু কোনো বড়ো বড়ো গুণের খাতিরেও দীন ও আখলাকের বঞ্চনা সহ্য করা যায় না। দীন ও আখলাকের ক্ষতি অন্য কোনো গুণ দিয়ে পূরণ করা যায় না। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ:

"বিয়ের জন্য সাধারণত মেয়েদের ব্যাপারে চারটি বিষয় দেখা হয়। সে চারটি বিষয় হলো: ধন-সম্পদ, বংশীয় আভিজাত্য, রূপ ও যৌবন এবং দীন ও আখলাক। তোমরা দীনদার মহিলাকে বিয়ে করো। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত।"

এ হাদীস এ নির্দেশই করে যে, আপনি আপনার পুত্রের জন্য এমন বন্ধু আনুন যে দীনদার এবং ইসলামী চরিত্রে সুসজ্জিত। এমন বধুর মাধ্যমেই আপনার গৃহ ইসলামের দুর্গ হতে পারে। আর এমন বধুর থেকেই এ আশা করা যেতে পারে যে, তার কোলেই এ ধরনের সন্তান আসবে, যে দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে হবে মজবুত এবং ইসলামের জন্যে হবে নিবেদিত প্রাণ।

এভাবে জামাই এবং বধু নির্বাচনেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ রয়েছে। সে নির্দেশেও দীন এবং আখলাককেই মৌলিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করে যার দীন ও আখলাকের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট এবং খুশী, তাহলে

তার সাথে নিজের কলিজার টুকরাকে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তোমরা তা না করো, তাহলে জমিনে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

এ হাদীস আপনাকে সিদ্ধান্তমূলকভাবে নির্দেশ দেয় যে, যখন আপনার নিকট কোনো এমন পাত্রের পয়গাম আসে, যার দীন ও আখলাকের ব্যাপারে আপনি সন্তুষ্ট। আপনার নিকট আস্থামূলক তথ্য আছে পাত্রটি আল্লাহ ভীরু, দীনদার, নামায-রোযার পাবন্দ এবং ইসলামী নৈতিকতায় সুসজ্জিত। তাহলে অহেতুক বিলম্ব করা কোনোমতেই ঠিক নয়। আল্লাহর উপর ভরসা করে তার সাথেই বিয়ে দিয়ে দিন এবং কল্যাণের আশা করুন। কেননা মুসলমানের বিয়ের সম্পর্কের জন্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো দীন ও ঈমান। যে সমাজে দীন ও ঈমানকে উপেক্ষা করে অন্য জিনিসকে গুরুত্ব দেয়া হয় অথবা ধন-সম্পদ ও রূপ-যৌবনকে দীন ও আখলাকের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাহলে এমন সমাজে ফেতনা ও ফাসাদের তুফান সৃষ্টি হয় এবং দুনিয়ার কোনো শক্তিই এমন সমাজকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

সন্তান প্রতিপালনের নিয়ম

বেহেশতী জেওরের চতুর্থ খণ্ডে “সন্তান প্রতিপালনের নিয়ম” শিরোনামে এ বিষয়ে কিছু জরুরি আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সেই আলোচনাটি হুবহু তুলে ধরা হলো। এই শিরোনামের কিছু কিছু বিষয় হয়তো পেছনেও আলোচনা করা হয়েছে, তবে যা জরুরি বিষয়, তা বারবার আলোচনা করাতে কোনো দোষ নেই।

ছোটবেলায় যেই আচার-আচরণ অভ্যাস করা হয়, পরবর্তী জীবনে সেটাই স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়। সুতরাং শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত যে স্বভাবগুলো শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তার কিছু কিছু নিচে দেওয়া হলো–

(১) যদি নিজের মা ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে দুধ খাওয়াতে হয়, তবে দ্বীনদার-পরহেজগার (ধার্মিক ও খোদাভীরু) মহিলার দুধ খাওয়াবে। কারণ, মানব চরিত্রে গভীরভাবে দুধের প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

(২) মায়েরা সাধারণত শিশুদের পুলিশ বা অন্য কোনো ভয়ংকর জিনিসের ভয় দেখিয়ে থাকে। এটা ঠিক নয়। এরূপ করলে বাচ্চাদের মন দুর্বল হয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

(৩) ছেলেমেয়েদের দুধ খাওয়া ও খাবারের সময় নির্দিষ্ট করে নিলে তাতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

(৪) বাচ্চাদের সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, এতেও তাদের দেহ-মন সুস্থ থাকবে।

(৫) ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবে না।

(৬) ছেলেদের মাথার চুল বেশি লম্বা হতে দেবে না।

(৭) মেয়েরা পর্দা করার পূর্বে তাদের অলঙ্কার পরতে দেবে না। কারণ, এর ফলে একদিকে যেমন জীবন ও মালের ওপর শঙ্কা দেখা দেয়, তাছাড়া অল্প বয়সেই গহনার প্রতি আকর্ষণ হওয়া ভালো নয়।

(৮) ছেলেমেয়েদের হাত দিয়ে গরিবদের দান করার এবং ভাই-বোনসহ অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে খাবারের জিনিস বিতরণ করার অভ্যাস করাবে। এতে স্বভাবে দানশীলতা আসবে এবং লোভের অভ্যাস কমবে। অবশ্য তারা যে সব জিনিসের মালিক, তা অন্য কাউকে দিতে বলা জায়েজ নয়। তোমাদের নিজস্ব জিনিস তাদের দিয়ে দান করাবে।

(৯) যারা বেশি খায় ছেলেমেয়েদের সামনে তাদের দুর্নাম করবে। অবশ্য বলার সময় কারও নাম উচ্চারণ করবে না। বরং এরূপ বলবে— যারা বেশি খায় লোকে তাদের ঘৃণা করে। (এতে ছেলেমেয়েদের কম খাওয়ার অভ্যাস হবে)।

(১০) ছেলেদের সাদা কাপড়ের অভ্যাস করাবে এবং রঙিন কাপড়ের নিন্দা করে বলবে, এটা মেয়েদের পোশাক; তুমি তো পুরুষ, এইসব তোমার জন্য মানায় না।

(১১) মেয়েদেরকে অতিরিক্ত দামি পোশাক এবং বিলাসিতার অভ্যাস করাবে না।

(১২) বাচ্চাদের সব জিদ পূরণ করবে না। এতে তাদের স্বভাব খারাপ হয়।

(১৩) বাচ্চাদের চিৎকার করে কথা বলতে দেবে না। বিশেষ করে মেয়েদেরকে তো খুবই তাগিদ করবে। অন্যথায় বড় হয়েও এই বদ-অভ্যাস থেকে যাবে।

(১৪) যেসব ছেলেমেয়ের স্বভাব খারাপ এবং লেখাপড়ায় অমনোযোগী, কিংবা যারা কেবল ভালো ভালো খাবার খেয়ে দামি পোশাকে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত; এই ধরনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনো বাচ্চাদের মিশতে দেবে না।

(১৫) ক্রোধ, মিথ্যা, হিংসা, চুরি, পরনিন্দা, অকারণে নিজের কথার ওপর জিদ করা, অর্থহীন কথা বলা, অকারণে হাসা বা অতিরিক্ত হাসা, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া, ভালো-মন্দ বিবেচনা না করা—ইত্যাদি অপরাধগুলোর প্রতি যেন ছেলেমেয়েদের আন্তরিক ঘৃণা জন্মায়, এই রকম উপদেশ দিতে থাকবে। কোনো ত্রুটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করবে এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে উপদেশ দেবে।

(১৬) ছেলেমেয়েরা অসাবধানতাবশত যদি কোনো জিনিস ভেঙে ফেলে বা নষ্ট করে ফেলে, কিংবা অন্য কাউকেও যদি মারে বা গালি দেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে যেন ভবিষ্যতে আর এই রকম না করে; এই সব ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিলে তাদের স্বভাব চিরতরে খারাপ হয়ে যাবে।

(১৭) ছেলেমেয়েদের অসময়ে ঘুমাতে দেবে না, (সময়মতো ঘুমাতে দেবে এবং সময়মতো ওঠাবে)।

(১৮) বাচ্চাদের ঘুম থেকে ভোরে যথাসময় ওঠার অভ্যাস করাবে।

(১৯) সাত বছর বয়স হলে নামাজ পড়ার অভ্যাস করাবে।

(২০) মক্তবে যাওয়ার বয়স হলে সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ পড়াবে (নিতান্ত কম বয়সে অতিরিক্ত পড়ার চাপ দেবে না। এর ফলে মেধা ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে)।

(২১) মক্তবে যেতে না চাইলে কখনো প্রশ্রয় বা ঢিল দেবে না। যেভাবেই হোক নিয়মিত মক্তবে যাওয়ার অভ্যাস করাবে।

(২২) শৈশবের শিক্ষা যেন দ্বীনদার পরহেজগার ওস্তাদদের (শিক্ষকদের) কাছে হয়, এই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

(২৩) ছেলেমেয়েদের মাঝে-মধ্যে আউলিয়া কেরামদের ঘটনা শোনাবে।

(২৪) ছেলেমেয়েদের নভেল-নাটক বা প্রেমিক-প্রেমিকার গল্প এবং শরীয়ত বিরোধী কিচ্ছা-কাহিনী পড়তে দেবে না।

(২৫) বাচ্চাদের এইরকম বিষয় পড়তে দেবে, যাতে ধর্মজ্ঞান ও নৈতিক উপদেশ লাভ হয় এবং দুনিয়ার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোও জানা যায়।

(২৬) পড়া শেষে মক্তব থেকে ঘরে ফেরার পর তাকে কিছুক্ষণ খেলতে দেবে। এতে তার মনের একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর হবে। এমন খেলা খেলতে দেবে যাতে কোনো গুনাহ ও মিথ্যা বলার সুযোগ না থাকে।

(২৭) কোনো প্রকার বাজনা, বাঁশি বা আতশবাজি কেনার জন্য ছেলেমেয়েদের পয়সা দেবে না।

(২৮) ছেলেমেয়েদের খেল-তামাশা (যেমন– সিনেমা, যাত্রা ইত্যাদি) দেখতে দেবে না।

(২৯) ছেলেমেয়েদের এমন কোনো হাতের কাজ অবশ্যই শিক্ষা দেবে, যা দিয়ে প্রয়োজনে হালাল রুজি উপার্জন করে যেন নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারে।

(৩০) মেয়েদের এই পরিমাণ লেখা শেখাবে, যা দিয়ে প্রয়োজনীয় হিসাব এবং চিঠি-পত্র লিখতে পারে। এর অতিরিক্ত শেখানোর প্রয়োজন নেই।

(৩১) ছেলেমেয়েদের যাবতীয় কাজকর্ম নিজ হাতে করার অভ্যাস করাবে। যেন অকর্মণ্য বা অলস হতে না পারে। রাতে ঘুমানোর সময় নিজ হাতে বিছানা করবে এবং সকালে উঠে নিজ হাতে তা গুটিয়ে রাখবে। নিজের কাপড় নিজেই হেফাজত করবে। কাপড়ের সেলাই খুলে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে নিজ হাতেই সেলাই করে নেবে। ধোপার কাছে কাপড় নিজেই গুনে দিয়ে লিখে রাখবে এবং ফেরত নেওয়ার সময় গুনে নেবে।

(৩২) মেয়েদের জেওর অলংকার ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে উঠে যেন ভালোভাবে দেখে নেয় যে, ঠিক আছে কি না—এর অভ্যাস করাবে।

(৩৩) রান্না করা, সেলাই করা, চরকা ঘোরানো, ফুল-বুটি তোলা, কাপড় রঙ করা ইত্যাদি যে সব কাজ বাড়িতে করতে হয়, মেয়েদের সেই সব কাজ দেখে দেখে শিখতে বলবেন।

(৩৪) ছেলেমেয়েরা যখন কোনো ভালো কাজ করে, তখন তাদেরকে আদর করে খুব সাবাস দেবেন; বরং কিছু উপহার দিলে আরও ভালো হয়। কারণ, এতে ভালো কাজে তাদের আগ্রহ বাড়বে। যখন কোনো খারাপ কাজ করে, তখন আড়ালে নিয়ে বোঝাবেন যে, এমন কাজ করলে সবাই তোমার নিন্দা করবে এবং কেউই তোমাকে ভালোবাসবে না। ভালো ছেলেমেয়েরা এমন কাজ করে না। লোকে বলবে ছোটলোকের সন্তান। পাপের কাজ করলে দোজখের (জাহান্নামের) আগুনের ভয় দেখাবেন। এই সব কথা আড়ালেই বোঝাবেন, যেন লজ্জা ভেঙে একেবারেই বেহায়া হয়ে না যায়। এরপরও যদি এই রকম করে, তবে কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

(৩৫) ছেলেমেয়েদের মনে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় তৈরি করা মায়ের কর্তব্য।

(৩৬) ছেলেমেয়েদের খাওয়া-দাওয়া বা খেলাধুলার কোনো কাজই গোপনে করতে দেবেন না। কারণ, তারা যে কাজ গোপনে করে, সেই কাজ তাদের কাছে খারাপ মনে

হয় বলেই গোপনে করে। সুতরাং আসলেই যদি সেই কাজ খারাপ হয়, তবে তো তা করতেই দেবেন না। আর যদি তা খারাপ না হয়, তবে সবার সামনে করতে আপত্তি কী?

(৩৭) ছেলেমেয়েদের দিয়ে নিয়মিত কোনো পরিশ্রমের কাজ অবশ্যই করাবেন, যেন তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং কর্মপ্রিয়তার অভ্যাস গড়ে ওঠে। যেমন, ছেলেদের ক্ষেত্রে এক-আধ মাইল হাঁটা বা দৌড়ানো এবং মেয়েদের যাতায় (শস্য) পেষা বা চরকা কাটা ইত্যাদি।

(৩৮) ছেলেমেয়েরা হাঁটার সময় যেন ওপরের দিকে তাকিয়ে বা (এদিক-ওদিক তাকিয়ে) খুব তাড়াহুড়ো করে না হাঁটে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

(৩৯) ছেলেমেয়েদের বিনয়ী ও নম্র আচরণ শিক্ষা দেবেন। কথায় বা কাজে কখনো গর্ব-অহংকার প্রকাশ করতে দেবেন না। এমনকি নিজের সমবয়সীদের সাথে বসে নিজের বাড়ি-ঘর, বংশ এবং নিজের বই-খাতা ও দোয়াত-কলমের প্রশংসা ও বড়াই করতে দেখলে নিষেধ করবেন।

(৪০) মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের নিজের ইচ্ছামতো কিছু কেনার জন্য দুই-চারটা টাকা দেবে। কিন্তু গোপনে কেনার অভ্যাস করতে দেবে না।

(৪১) ছেলেমেয়েদের খাওয়া-দাওয়া ও মজলিশে ওঠা-বসার আদব-কায়দা শিক্ষা দেবে।

(৪২) বর্তমানে মোবাইলের ব্যাপক প্রচলন, এসব ফেতনা থেকে সন্তানকে সর্বোচ্চভাবে সরিয়ে রাখতে হবে। অতি জরুরি কারণে যদি স্মার্টফোন লাগেই তবে তার এক্সেস পিতা মাতার কাছে রাখতে হবে। এবং এসব ডিভাইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমানে এই স্মার্টফোন হচ্ছে সকল পাপের মূল।

(৪৩) বাসার মধ্যে হারাম জিনিস বা বিনোদনের হারাম উপায় নষ্ট করে দিতে হবে। টেলিভিশন বা এ জাতীয় যত ধরনের জিনিস আছে এগুলো বাসায় না রাখাই সবচেয়ে উত্তম। এসব জিনিস হচ্ছে পাপের কান্ডারী

কতিপয় জরুরি হেদায়েত (কিছু জরুরি নির্দেশনা)

ছেলেমেয়েদের অবশ্যই শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস করাবে। বরং ছেলেদের পরিমিত ব্যায়াম এবং মেয়েদের জাঁতা পেষণ ও চরকা কাটার অভ্যাস করাবে।

যত কম বয়সে খতনা করানো যায় ততই ভালো। তাতে কষ্ট কম হয় এবং দ্রুত ঘা শুকিয়ে যায়।

বাচ্চারা যেন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে লক্ষ রাখবে। হাত-মুখ ময়লা হওয়ার সাথে সাথেই পরিষ্কার করে দেবে। তাদের মাজন ও মেসওয়াক ব্যবহারের অভ্যাস করাবে।

যেসব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে তাদের সর্বদা কিছু স্নায়ুবিক শক্তি বর্ধক পুষ্টিকর খাবার খাওয়াবে।

শিশুদের বেশি হাসানোর জন্য আদর করার ছলে উপরের দিকে ছুড়ে খেলবে না, কিংবা জানালার মধ্য দিয়ে ধরবে না; হয়তো পড়ে গিয়ে হাসির জায়গায় বড় বিপত্তি ঘটে যেতে পারে। একইভাবে শিশুদের পেছন থেকে হাসাতে হাসাতে দৌড়াবে না। হয়তো পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে যেতে পারে।

সব সময় ভালো খাওয়া-পরার অভ্যাস করবে না। কারণ, মানুষের অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না। যদি এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তবে হয়তো এক সময় বিপদে পড়তে হবে।

তোমার বাচ্চা যদি কারও সাথে কোনো অন্যায় আচরণ করে, তবে সেক্ষেত্রে তুমি নিজের সন্তানের পক্ষ নিও না। বিশেষ করে নিজের বাচ্চার সামনে এরূপ করলে তার স্বভাব নষ্ট হয়ে যাবে। একইভাবে অন্য মানুষের কাছে নিজের সন্তানদের প্রশংসা করবে না।

নিজের শাগরিদ (ছাত্র) বা সন্তানদের কখনো শক্ত লাঠি দিয়ে আঘাত কিংবা লাথি-ঘুষি দেবে না। আল্লাহ না করুন—দেহের কোনো নাজুক (নরম/সংবেদনশীল) অংশে আঘাত লাগলে হয়তো উপকারের চেয়ে ক্ষতি হতে পারে। চেহারা এবং মুখমণ্ডলেও আঘাত করবে না।

মেয়েদের বলে দেবে যেন ছেলেদের সঙ্গে খেলা না করে। কারণ এতে উভয়েরই স্বভাব নষ্ট হয়। ঘরে যদি অন্য কোনো ছেলে আসে (যদি তার বয়স কমও হয়), তখন সামনে থেকে সরে যাবে।

বাচ্চাদের বাবা-মা এবং দাদার নাম শিখিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে দেখবে তা মনে আছে কি না। এর একটা সুবিধা এই যে, আল্লাহ না করুন, যদি কখনো হারিয়ে যায়, তখন লোকেরা হয়তো বাবা-মা'র পরিচয় জানতে পারলে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবে।

শাস্তি দেওয়ার উত্তম ও অনুত্তম পদ্ধতি

"তা'যীর" ওই শাস্তিকে বলা হয় যা ছেলেমেয়েরা অপরাধ করলে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং পরিমিত পর্যায়ে দেওয়া হয়। এই শাস্তিরও বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি রয়েছে। যেমন— তিরস্কার করা, রাগ করা, কান মলে দেওয়া, কড়া ভাষায় শাসিয়ে দেওয়া, আটকে রাখা, অর্থদণ্ড দেওয়া এবং হাত বা বেত দিয়ে প্রহার করা।

ইসলামে সন্তানদের লালন-পালন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে দয়া, মায়া ও বোঝানোর ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তবে অবাধ্যতা বা ভুলের ক্ষেত্রে শাসনের কিছু স্তর বিন্যাস রয়েছে। ইসলামে সন্তানদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন কিছু পদ্ধতি বা আচরণ রয়েছে, যেগুলোকে **অনুত্তম, অনুচিত বা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ** বলা হয়েছে।

নিচে ইসলামি শরিয়াহ ও সুনীতি অনুযায়ী সন্তানদের শাস্তি দেওয়ার অনুত্তম ও বর্জনীয় পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলো:

১. মুখে আঘাত করা বা চড় মারা (সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) কঠোরভাবে মুখমণ্ডলে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে প্রহার করে, সে যেন অবশ্যই মুখমণ্ডল পরিহার করে।" (সহীহ মুসলিম)

মুখমণ্ডল মানুষের সম্মানের প্রতীক এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল অংশ। তাই সন্তানদের শাসন করার জন্য কখনো মুখে চড় বা থাপ্পড় দেওয়া যাবে না।

২. রাগের মাথায় প্রহার করা

পিতা-মাতা বা শিক্ষকের নিজের রাগ কমানোর জন্য সন্তানকে মারধর করা ইসলামের দৃষ্টিতে মস্ত বড় অন্যায়। শাসন হতে হবে কেবলই সন্তানের সংশোধনের উদ্দেশ্যে, নিজের ক্ষোভ ঝাড়ার জন্য নয়। রাগ অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অনুত্তম।

৩. শরীরের সংবেদনশীল জায়গায় আঘাত করা

মাথা, বুক, পেট বা নাযুক কোনো অঙ্গে আঘাত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যদি কখনো শাসনের জন্য হালকা মারার প্রয়োজনও হয় (যা কেবল ১০ বছর বয়সের পর নামাজের মতো ফরজ বিধান অবহেলার ক্ষেত্রে মৃদুভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে), তবে তা যেন এমন না হয় যা চামড়া কেটে যায়, হাড় ভেঙে যায় বা শরীরে দাগ পড়ে যায়।

৪. গালমন্দ করা, অভিশাপ দেওয়া বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কোনো শিশুকে গালমন্দ বা অভিশাপ দেননি। মুখে খারাপ ভাষা ব্যবহার করা, "তুই একটা গাধা/অপদার্থ", বা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে বদদোয়া করা অত্যন্ত অনুত্তম কাজ। কারণ মা-বাবার দোয়া বা বদদোয়া সন্তানের হকে দ্রুত কবুল হয়ে যায়।

৫. অন্যের সামনে লজ্জিত বা অপমানিত করা

ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব বা কোনো মেহমানের সামনে সন্তানকে মারধর বা তিরস্কার করলে তার আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়ে যায়। এতে সন্তান জেদি ও একগুঁয়ে হয়ে ওঠে। সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি হলো তাকে আড়ালে ডেকে নরম ভাষায় বোঝানো।

৬. অতিরিক্ত কঠোরতা বা অমানুষিক শাস্তি

সন্তানকে ঘরে আটকে রাখা, খাবার বন্ধ করে দেওয়া, বা রোদ-বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রাখার মতো নিষ্ঠুর পদ্ধতিগুলো ইসলাম সমর্থন করে না। মহানবী (সা.) বলেছেন:
"যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।" (সহীহ বুখারী)

উত্তম পদ্ধতিঃ

১. ভালোবাসা, স্নেহ ও প্রশংসার মাধ্যমে (পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট)

সন্তানকে সুপথে রাখার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো তাকে ভালোবাসা দেওয়া।

প্রশংসা করা: সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে সবার সামনে তার প্রশংসা করুন। এতে সে ওই কাজটি বারবার করার উৎসাহ পাবে।

পুরস্কার দেওয়া: ভালো আচরণের জন্য ছোটখাটো উপহার বা চকলেট দিয়ে পুরস্কৃত করতে পারেন।

২. বুঝিয়ে বলা ও নসিহত করা (পরামর্শ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের সাথে সবসময় কথা বলে, বুঝিয়ে এবং স্নেহের সাথে শেখাতেন।

সন্তান ভুল করলে তাকে আড়ালে ডেকে নরম সুরে বুঝিয়ে বলুন যে, কাজটি কেন ভুল এবং এর ফলে কী ক্ষতি হতে পারে।

কুরআনে লোকমান হাকিম যেভাবে তার সন্তানকে ভালোবেসে "হে বৎস!" সম্বোধন করে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

৩. ভালো কাজের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের (নামাজের) নির্দেশ দাও। অর্থাৎ, এই সাত বছর তাকে মারধর না করে কেবল অভ্যাসে পরিণত করার জন্য ভালোবেসে ও বুঝিয়ে নামাজের কথা বলতে বলা হয়েছে।

৪. সাময়িক মৌনতা বা অভিমান প্রকাশ (হিজর)

যদি সন্তান বারবার বলার পরও ভুল করতে থাকে, তবে কঠোর শাস্তির দিকে না গিয়ে সাময়িক মানসিক চাপ তৈরি করা যেতে পারে।

কথা বন্ধ করা: আপনি তার ওপর অসন্তুষ্ট—এটি বোঝানোর জন্য কিছুক্ষণ বা কয়েক ঘণ্টা তার সাথে স্বাভাবিক কথা বলা বন্ধ রাখতে পারেন (তবে তা যেন ৩ দিনের বেশি না হয়)।

সুযোগ সুবিধা কমানো: তার প্রিয় কোনো খেলনা বা পছন্দের কোনো জিনিস সাময়িকভাবে কিছুক্ষণের জন্য তার থেকে দূরে রাখতে পারেন।

প্রসঙ্গ: অধিক শাস্তি ও কঠোরতা

অধিক শাসন ও কঠোরতার ফল কখনো ভালো হয় না। যে সব ছেলেমেয়েকে উঠতে-বসতে লাথি-ঘুষি ও শাসনের মধ্যে রাখা হয় তাদের হায়া-শরম নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে তারা আর কাউকেই ভয় করে না। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি, অধিক মারধর করলে তা'লীম-তরবিয়তের (শিক্ষা-দীক্ষার) ক্ষেত্রেও বিশেষ কোনো ফায়দা হয় না। বরং এর ফলাফল খারাপই হয়ে থাকে।

অধিক প্রহার করলে প্রথমত: বাচ্চাদের অঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত: বাচ্চারা আতঙ্ক ও ভয়ে মুখস্থ পড়াও ভুলে যায় এবং মার খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর লজ্জা-শরম ও ভয় ভেঙে যায়। অতঃপর কোনো শাসনই তার ওপর আর আছড় কাটে না। এই পর্যায়ে নির্লজ্জতা তার পক্ষে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয় এবং জীবনে আর কখনো তার স্বভাব থেকে এই ব্যাধি দূর করা সম্ভব হয় না।

এমন ভয়ানক শাস্তি দেওয়া ঠিক নয় যা বাচ্চারা সহ্য করতে পারে না। যেমন— উত্তপ্ত রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা বা লাঠি দ্বারা নির্দয়ভাবে প্রহার করা ইত্যাদি। অনেকে আবার কেউ অন্যায় করলে অন্য কারো দ্বারা থাপ্পড় দেওয়ায়। কিন্তু আমি এরূপ করতে নিষেধ করি। এই নিয়ম ভালো নয়, এর ফলে পরস্পরের মধ্যে দুশমনী (শত্রুতা) তৈরি হয়।

এক ধরণের পিতা-মাতাকে ছোট শিশুর সঙ্গেও ভীষণ রাগ করতে দেখা যায়। বরং কোনো কোনো সময় তো এমনভাবে প্রহার করতে থাকে, যেন কোনো নির্দয় কসাই কোনো প্রাণীকে প্রহার করছে। এভাবেই পিতা-মাতারা বাচ্চাদের ওপর জুলুম করে থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখবে, পিতা হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তুমি তার জানেরও মালিক হয়ে গেছ। যদি তাহাই হতো তবে তো পিতা পুত্রকে বিক্রিও করতে পারত।

আল্লাহ পাক পিতাকে অনেক মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু তা এই জন্য নয় যে, সে তার শিশু-সন্তানের মালিক হয়ে যাবে এবং তাকে কষ্ট দিতে থাকবে। বরং শিশুর সযত্ন প্রতিপালনই তার কর্তব্য। তবে হ্যাঁ, এই প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো সময় তাকে শাস্তি দেওয়ারও প্রয়োজন হতে পারে এবং তার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। তবে এই পরিমাণ শাস্তিই দেবে যা তার প্রতিপালন ও তরবিয়তের (উপযুক্ত শিক্ষার) জন্য কল্যাণকর হবে। তার অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ার অনুমতি নেই। অর্থাৎ— এমন শাস্তি দেওয়া যাবে না যা সে সহ্য করতে পারবে না। তা ছাড়া পিতামাতার পক্ষ থেকে এই ধরনের কঠোরতা গুনাহ তো বটেই, সেই সঙ্গে তা মানবতা ও স্বভাবসুলভ আচরণেরও পরিপন্থী। পিতামাতাকে তো আল্লাহ পাক সন্তানের জন্য রহমত স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের আচরণ প্রকাশ পাওয়ার অর্থ হলো তারা ন্যূনতম মানবতাবোধও বিসর্জন দিচ্ছে।

'জরবে ফাহেশ' (বা অতিরিক্ত শাস্তি) প্রদান করতে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ নিষেধ করেছেন। যে প্রহারের দ্বারা শরীরে দাগ বসে যায়, ফকীহগণ তাকেও জরবে ফাহেশের মধ্যে গণ্য করেছেন। আর যে প্রহারের দ্বারা হাড় ভেঙে যায় কিংবা চামড়া ফেটে যায় তা তো আরও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। জরবে ফাহেশ বা অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করলে খোদ ওস্তাদ ও পিতামাতাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

রাগের সময় শাস্তি দেবে না

রাগ ও ক্ষোভ যথাসম্ভব দমন করে রাখবে। রাগের সময় ভালো-মন্দের জ্ঞান থাকে না। সুতরাং ওই সময় কোনো বিষয়ে ফায়সালা (বা সিদ্ধান্ত) করতে নেই। রাগের সময় মন উত্তেজিত থাকে এবং এই উত্তেজনার ক্ষতিকর দিকগুলো তখন সঠিকভাবে বোঝা যায় না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, রাগ ও ক্ষোভ দমন করা সবসময়ই কল্যাণকর হয়েছে এবং তা অব্যাহত রাখার (বা ছেড়ে দেওয়ার) পরিণতি ক্ষতিকর হয়েছে। রাগের সময় তাড়াহুড়ো করে কখনো কোনো কাজ করবে না। হাদিস শরিফেও রাগের সময় কোনো

ফায়সালা করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং রাগের সময় কখনো বাচ্চাদের মারধর করবে না। বরং রাগ কমে যাওয়ার পর শান্ত মাথায় চিন্তাভাবনা করে শাস্তি দেবে।

এক মহিলা একটি বিড়ালকে শাস্তি দিয়েছিল। মহিলার মৃত্যুর পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সেই বিড়ালটি তাকে আঁচড়াচ্ছে। একটি বিড়ালকে শাস্তি দেওয়ার কারণে যদি জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হয়, তবে (মানব) সন্তান তো ইনসান (বা আশরাফুল মাখলুকাত, সুতরাং এই ক্ষেত্রে আরও কঠোর শাস্তি হওয়াই স্বাভাবিক)।

যদি অতিরিক্ত রাগ এসে পড়ে তবে অপরাধীর সামনে থেকে সরে যাবে কিংবা তাকেই সরিয়ে দেবে এবং ঠান্ডা পানি পান করবে। অতিরিক্ত রাগের সময় এরূপ চিন্তা করবে যে, আমার ওপরও তো আল্লাহর হক আছে, অথচ আমার দ্বারা অহরহ ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ যখন আমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তখন আমারও উচিত অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া। অন্যথায় আমার কাছ থেকে যদি প্রতিশোধ নিতে চান, তখন আমার কী উপায় হবে?

সন্তানের এসলাহ ও তরবিয়ত

বাচ্চাদের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য আল্লাহওয়ালাদের (সৎ ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের) সংশ্রবও আবশ্যক। তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবে যে, এই সময়ে অমুক মসজিদে অমুক বুজুর্গের কাছে গিয়ে বসবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল এই সব বিষয়ের প্রতি মোটেও লক্ষ করা হয় না।

খেলাধুলা এবং আমোদ-প্রর্তি করার জন্য সময় বের করা যায়, কিন্তু নিজের আমল-আখলাক (চরিত্র) ঠিক করার জন্য সময় পাওয়া যায় না।

যাই হোক, শহরে বা আশেপাশে যদি কোনো আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ পাওয়া না যায়, তবে ছুটির সুযোগে তাদেরকে কোনো বুজুর্গের খেদমতে পাঠিয়ে দেবে। এই সময় তাদের কোনো কাজ থাকে না। দিনরাত কেবল ঘুরে-ফিরে সময় নষ্ট করে।

সন্তানকে নসিহত (উপদেশ) করার বিষয়টি বড় সূক্ষ্ম। নসিহত সাধারণত দুটি পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে—হয় উস্তাদের পক্ষ থেকে, কিংবা পিতার পক্ষ থেকে। অন্য সবার

নসিহতের তুলনায় পিতার নসিহতের মধ্যে বেশ কিছুটা তফাত আছে। উস্তাদ হয়তো বিধিবদ্ধ নসিহত করেই নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন।

পক্ষান্তরে, পিতা কেবল নিয়মের নসিহত করেই নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করতে পারবেন না। বরং সন্তানকে নসিহত করার সময় তিনি এমন সব উপায় অবলম্বন করবেন এবং এমনভাবে কথা বলবেন, যেন তা তার মনের গভীরে গিয়ে কাজ করে। কারণ, তিনি আন্তরিকভাবেই এটা কামনা করেন যেন তার সন্তানের এছলাহ (সংস্কার) ও সংশোধন হয়ে যায় এবং এতে কোনো ধরনের কমতি বা ত্রুটি না থাকে। এই ক্ষেত্রে পিতা যদি কোনো কঠিন বিষয়ের প্রতিও ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তবে সেটাও এমন সহজভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন ছেলে সহজেই তার ওপর আমল করতে (মেনে চলতে) পারে। সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসার কারণেই পিতার পক্ষে এতটা আন্তরিক হওয়া সম্ভব হয়।

মোটকথা, স্নেহ ও ভালোবাসার সঙ্গে যখন তরবিয়ত (লালন-পালন বা শিক্ষা) করা হবে, তখনই সম্ভাব্য সব ছাড় দেওয়া এবং চরম ধৈর্যের সঙ্গে সংশোধনের সহজ মাধ্যম উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

শিশুদের লালন-পালনের (তরবিয়তের) কয়েকটি নিয়ম

✯ শিশু কিছুটা জ্ঞান-বুদ্ধি পাওয়ার পর সর্বপ্রথম তাকে কালেমায়ে তাওহিদ শিক্ষা দেবে। তারপর ধীরে ধীরে তাকে জরুরি আদবসমূহ শিক্ষা দেবে।

শিশুদের এসলাহ ও তরবিয়ত (সংশোধন ও আদর্শ গঠন)

- বাচ্চাদের শুরু থেকেই নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার অভ্যাস করাবে।
- শৈশব থেকেই যেন মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে কোনো ত্রুটি না করে, এই বিষয়ে লক্ষ রাখবে। গরিব-মিসকিনদের সাথে মেলামেশা করতে উৎসাহিত করবে। গরিবদের সাথে চলাফেরা করলে তারা তোমাদের কদর ও সম্মান করবে। অন্যদিকে ধনী ও বিত্তবানদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তাতে তোমাদের সম্মান বাড়বে না, তারা কখনো তোমাদের সম্মানের চোখে দেখবে না। সুতরাং শৈশব থেকেই বাচ্চাদের সাধারণ মানুষের সাথে চলাফেরা করার উৎসাহ দেবে। শৈশবে এই সব বিষয় অভ্যাস করানো যতটা সহজ, বড় হওয়ার পর আর ততটা সহজ থাকে না।

- বাচ্চারা যেন কখনো সুন্নতের পরিপন্থী কোনো পোশাক এবং বিজাতীয়দের ফ্যাশন অনুকরণ না করে, এই বিষয়ে লক্ষ রাখবে।
- অন্য কোনো কাজের ক্ষতি না হয় এমন একটি নির্দিষ্ট সময় বের করে প্রতিদিন বাচ্চাদের কোনো দ্বীনি বই পড়তে দেবে কিংবা নিজে পড়ে শোনাবে। ঘুমানোর আগে অল্প সময়ের জন্য এই আমলটি করা যেতে পারে।
- বাচ্চাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যখন বন্ধ হয়, তখন দুই-চার দিনের জন্য তাদেরকে কোনো আল্লাহওয়ালার সাহচর্যে (কিংবা জামায়াতে) নিয়ে যাবে। ছুটির পুরো দিনগুলো যদি এই কাজে ব্যয় করা সম্ভব না হয়, তবে অর্ধেক ছুটি খেলাধুলার জন্য এবং অর্ধেক ছুটি এই কাজে ব্যয় করবে।

মোটকথা, নিয়ম মেনে নিয়মিত দ্বীনের আহকাম ও মাসায়েলের বই পড়া এবং মাঝে-মধ্যে আল্লাহর অলিদের (আল্লাহওয়ালাদের) সংশ্রব পাওয়ার সিলসিলা জারি রাখবে। শৈশব থেকেই যদি এই অভ্যাস করানো হয়, তবে সহজেই তারা এটি মেনে চলবে।

- বাচ্চারা যদি কখনো মানুষের গীবত-শেকায়েত করে, তবে স্নেহের সাথে বুঝিয়ে বলবে— মানুষের নিন্দা করা ভালো নয়, তাতে পাপ হয়। একইভাবে অহংকার-তাকাব্বুরী ও মিথ্যা বলা থেকেও তাদেরকে বাধা দেবে। স্কুলে যদি জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার নিয়ম না থাকে, তবে ছুটির সময় অবশ্যই তাদেরকে জামায়াতে নামাজ পড়ার অভ্যাস করাবে।
- বড় হওয়ার পর যদি একটানা দুই-এক বছর কোনো আল্লাহর অলির সংশ্রবে থাকার সুযোগ হয়, তবে খুবই ভালো। এতে তাদের আমল-আখলাকের অনেক উপকার হবে। পুরো বছরের সুযোগ না হলে অন্তত ছয় মাস, যদি তাও না হয় তবে চল্লিশ দিন হলেও এই কাজে ব্যয় করবে। হাদিসে পাকে এই সংখ্যার বহু ফজিলত এসেছে।
- বাচ্চাদের মনে যেন কখনো কোনো বস্তুর লোভ তৈরি না হয়, এই বিষয়ে লক্ষ রাখবে। এর সহজ উপায় হলো— নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পছন্দের জিনিসগুলো নিজেই এনে খেতে দেবে। আর বাচ্চারা জিদ করলে কখনো তা পূরণ করবে না, যেন জিদ করার অভ্যাস ছুটে যায় এবং ভবিষ্যতে আর কখনো তা না করে।
- শিশুদের এমন অভ্যাস করাবে যেন কোনো খাবার জিনিস একা না খায়। বরং যা খাবে, সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে খাবে। এই কারণেই তাদেরকে যখন কোনো

কিছু দেবে (টাকা বা জিনিস), তখন সেটির মালিক বানিয়ে দেবে না। কারণ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের কোনো কিছুর মালিক বানিয়ে দিলে, পরবর্তীতে আর তা কাউকে দান করা বা উপহার (হাদিয়া) দেওয়া জায়েজ থাকে can। এই কারণেই তাদেরকে যা কিছুই দেবে, কেবল ব্যবহার করা বা খাওয়ার অনুমতি দেবে, মালিক বানিয়ে দেবে না।

দিবে। সবাইকে সালাম করা, মিথ্যা না বলা এবং পর্দা ও হায়া-শরম ইত্যাদির শিক্ষা দেবে।

- ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে খেলতে দেবে না, এতে তারা ভবিষ্যতের বিভিন্ন ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকবে। শিশু যদি একেবারেই অবুঝ হয়, তবুও তাদের সামনে কোনো অসঙ্গত আচরণ করবে না। কারণ, তারা কিছু না বুঝলেও সেই আচরণের ছবি তাদের মনে গেঁথে থাকে। পরবর্তীতে ভবিষ্যতে এর প্রভাব তাদের চরিত্রে প্রকাশ পায়।
- বেশি হাসি-ঠাট্টা করতে দেবে না, এতে ছেলেমেয়েদের চরিত্রে উশৃঙ্খলতা তৈরি হয়।
- ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পর যেন পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখবে। এর মাধ্যমেই বিভিন্ন ক্ষতির সূত্রপাত হয়। যদি তারা পরস্পরের মধ্যে নির্দোষ খেলাধুলায় লিপ্ত হয়, তবে কাছাকাছি থেকে নজরদারি করবে, যেন এর সূত্র ধরে পরে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ না পায়।
- ছেলেমেয়েরা কোনো কাজই যেন গোপনে না করে, সেই অভ্যাস করাবে। কারণ, যেসব কাজ খারাপ, সেগুলোই গোপনে করা হয়। সুতরাং এই অভ্যাস তৈরি হতে দেবে না।
- ছেলেমেয়েদের এমন অভ্যাস করাবে, যেন কখনো অন্যায়ের পক্ষ না নেয়। নিজের ভুল ধরা পড়ার পর প্রতিপক্ষ ছোট হলেও অকপটে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেবে। এই অভ্যাস অত্যন্ত জরুরি। এতেই দীন ও দুনিয়ার স্বস্তি ও শান্তি। যদি এমনটা করা না হয়, তবে মনের ভেতর অহংকার তৈরি হয়ে স্থায়ী অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়।

সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার সংরক্ষণ

সন্তান হত্যা বিষয়টি স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে খুবই আশ্চর্যজনক! এটা কোনোভাবে হতেই পারে না। কিন্তু এই আশ্চর্যজনক ও জঘন্যতম অপরাধটিও পৃথিবীতে অহরহ হচ্ছে। কোথাও দারিদ্র্যের কষাঘাতে, কোথাও ব্যভিচারের ভয়াবহ পাপকে গোপন করতে, কোথাও-বা অন্য কোনো অভিনব কারণে সন্তান ও ভ্রূণ হত্যা হচ্ছে। এমন জঘন্যতম কাজ ধর্মীয় ও দেশীয় আইন উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধ থেকে নিজে বাঁচতে হবে, সমাজকেও বাঁচাতে হবে।

সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহর পবিত্র আমানত। এ আমানতের খেয়ানত করার অধিকার কোনো বাবা-মায়ের নেই। মা-বাবা কোনো অবস্থাতেই সন্তান হত্যা করতে পারবে না; এমনকি চরম দারিদ্র্যের ভয় থাকলেও নয়। আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

﴿وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا﴾٣١
"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। তাদের জীবিকা আমিই জোগাব আর তোমাদের জীবিকাও। জেনে রাখো, সন্তান হত্যা করা জঘন্য অপরাধ।"
সূরা ইসরা: ৩১
ইসলাম সকল পর্যায়ে সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত-

أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ " أَنْ تَجْعَلَ اللَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ " ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ " أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ. ۔
"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন-'আল্লাহর নিকট কোনটি সবচেয়ে বড়ো অপরাধ?' নবিজি বললেন-'আল্লাহর কোনো সমকক্ষ নির্ণয় করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' ইবনে মাসউদ রা. পুনরায় জানতে চাইলেন-'এরপর কোনটি?' রাসূল সা. বললেন-'সন্তানকে হত্যা করা সে তোমার সঙ্গে খাবে বলে।' ইবনে মাসউদ রা. আবার জানতে চাইলেন-'অতঃপর কোনটি?' রাসূল সা. বললেন-'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।" বুখারি: ৪৪০৪

ভ্রূণ হত্যা ও গর্ভপাত সন্তান হত্যার প্রাথমিক স্তর। ইসলাম ভ্রূণ হত্যা ও গর্ভপাতকেও হারাম ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা.-কে নারীদের বাইয়াতের শর্তাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা দেন। সেই শর্তাবলির অন্যতম হচ্ছে সন্তান হত্যা না করার শপথ। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে-

يأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيم﴾١٢﴿

“হে নবি, মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বাইয়াত করে এ মর্মে-তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরিক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন।" সূরা মুমতাহিনা: ১২

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ হারাম। অকারণে স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত কিংবা জীবিত সন্তান হত্যা যেভাবেই হোক না কেন, এটা আল্লাহর কাছে জঘন্য একটি অপরাধ এবং মহাপাপ।

সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার

সন্তান ছেলে হোক কিংবা মেয়ে, ছোটো বা বড়ো যা-ই হোক না কেন, ইসলাম সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছে। মা-বাবার আচার-আচরণ, স্নেহ-মমতা, দান-অনুদান, শাসন-অনুশাসন সবকিছুতেই সব সন্তানের প্রাপ্য সমান। পিতা-মাতার ওপর সকল সন্তানের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা দান, উপহার ও ব্যয়ের ব্যাপারে সন্তানদের মাঝে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন নীতি অবলম্বন করবেন। কারও প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়বেন না এবং কাউকে বঞ্চিত করবেন না। ন্যায় ও সুসম নীতি অবলম্বন করবেন। নবি করিম সা. বলেছেন-

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُم. ْ

"তোমাদের সন্তানদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো। তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।" আহমাদ: ৩৫০৬

এই সম্পর্কে একটি মশহুর ঘটনা রয়েছে। প্রায় সবগুলো সহিহ হাদিসগ্রন্থে নুমান ইবনে বশিরের বর্ণিত এ হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত বশির আনসারির স্ত্রী তাঁর পুত্র নুমান ইবনে বশিরকে একটি বাগান অথবা গোলাম দান করার জন্য স্বামীকে পীড়াপীড়ি করেন। এতে বশির রা. ওই ছেলেকে তা দান করেন। কিন্তু নুমানের মা এ দানকে পাকাপোক্ত করার জন্য রাসূল সা.-কে সাক্ষী রাখার দাবি করেন। সে মতে তিনি নুমানকে সাথে নিয়ে নবি সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন- 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্ত্রী উমরার গর্ভজাত এ পুত্রকে (নুমানকে) একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু উমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখার আবদার করছি' তখন নবি করিম সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন-'তুমি কি তোমার সব ছেলেকে অনুরূপ দান করেছ? 'বশির বললেন-'জি না।'

এটা শুনে নবি করিম সা. বললেন- 'আল্লাহকে ভয় করো। সন্তানদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করো। আমি এ জুলুমের সাক্ষী হতে পারব না।'

অতপর হযরত বশির ফিরে এসে তার দান ফেরত নিলেন। বুখারি: ২৫৮৬; মুসলিম : ১৬২৩

ইসলামিক শরীয়াহ অনুযায়ী সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ইসলামে সন্তানদের অধিকার, তাদের প্রতি আচরণ এবং সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও ইনসাফপূর্ণ নীতিমালা রয়েছে।

সন্তানদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের বিষয়টি মূলত দুটি অবস্থায় বিভক্ত: ১. পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় উপহার বা হেবা প্রদান, এবং ২. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার বন্টন।

নিচে এই দুটি বিষয়ের আলোকপাত করা হলো:

১. জীবিত অবস্থায় সন্তানদের সম্পদ বা উপহার দেওয়া

পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় নিজের সম্পদ সন্তানদের মাঝে বন্টন বা উপহার দিতে চাইলে, সেখানে শতভাগ সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ওয়াজিব বা আবশ্যক।

ছেলে-মেয়ে সমানাধিকার: জীবিত অবস্থায় উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে—উভয়কে সমানভাবে দিতে হবে। এখানে "ছেলেরা মেয়ের দ্বিগুণ পাবে" এই নিয়ম খাটবে না।

ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি: যদি কোনো সন্তানের বিশেষ কোনো যৌক্তিক প্রয়োজন থাকে—যেমন কোনো সন্তান যদি গুরুতর অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী হয়, কিংবা দ্বীনি শিক্ষার পেছনে নিয়োজিত থাকার কারণে উপার্জন করতে না পারে—তবে তার চিকিৎসার বা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য অন্য সন্তানদের চেয়ে কিছু বেশি দেওয়া জায়েজ। তবে তা যেন অন্য সন্তানদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে না হয়।

২. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার বন্টন

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পদ আর তাঁদের ইচ্ছাধীন থাকে না। সেটি সরাসরি আল্লাহর নির্ধারিত 'ফারায়েজ' বা উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী বন্টন করতে হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নিসার ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা সন্তানদের অংশ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন:

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার) সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান..." (সূরা আন-নিসা: ১১)

ছেলে ও মেয়ের অংশের এই পার্থক্যের কারণ:

ইসলামে বাহ্যিকভাবে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ মনে হলেও এর পেছনে রয়েছে নিখাদ অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার:

আর্থিক দায়বদ্ধতা: ইসলামে নারীর যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত। বিয়ের আগে বাবার এবং বিয়ের পর স্বামীর। এমনকি কোনো নারী যদি ধনীও হন, তবুও নিজের বা পরিবারের জন্য এক টাকাও খরচ করার আইনি বা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা তাঁর নেই।

পুরুষের ওপর চাপ: অপরপক্ষে, একজন পুরুষকে নিজের, স্ত্রীর, সন্তানদের এবং প্রয়োজনে মা-বাবা ও বোনদেরও দায়িত্ব নিতে হয়। পুরুষকে যেহেতু বিশাল আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে হয়, তাই শরিয়ত তাকে উত্তরাধিকার সূত্রে বেশি অংশ দিয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সতর্কতা ও সাধারণ ভুল

আমাদের সমাজে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু গুরুতর ভুল হতে দেখা যায়, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ:

মেয়েদের বঞ্চিত করা: অনেক সময় "মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি" বা "মেয়েরা স্বামীর বাড়ি চলে গেছে" এই অজুহাতে বাবার সম্পত্তি থেকে বোন বা মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়। এটি কবিরা গুনাহ এবং অন্যের হক নষ্ট করার শামিল।

জীবদ্দশায় মিরাসের নিয়মে বণ্টন: অনেকে জীবদ্দশায় সম্পদ দেওয়ার সময় ছেলে ও মেয়েকে ২:১ অনুপাতে (ছেলেকে ডাবল, মেয়েকে অর্ধেক) দিয়ে দেন। এটি ভুল। জীবদ্দশায় দিলে সবাইকে সমান দিতে হবে। ২:১ অনুপাত কেবল মৃত্যুর পরের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কাউকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অসিয়ত করা: কোনো সন্তানকে রাগ করে বা অন্য কোনো কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য উইল বা অসিয়ত করা ইসলামে বাতেল বা নিষিদ্ধ

সন্তানদের মধ্যে ভালোবাসা ও পারিবারিক বন্ধন টিকিয়ে রাখার মূল চাবিকাঠি হলো পিতামাতার ন্যায়বিচার। জীবদ্দশায় উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সবাইকে সমান চোখে দেখা এবং মৃত্যুর পর আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী নিখুঁতভাবে সম্পদ বণ্টন করাই হলো ইসলামিক আদর্শ।

এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আত্মীয় স্বজন বা যেকোনো মানুষের থেকে প্রাপ্ত হাদিয়া সন্তানদের দেওয়া হয়না, এটা অবশ্যই গুনাহের কাজ। যেমন সন্তান উপলক্ষে যদি কোনো আচার অনুষ্ঠান করে থাকে এবং সেই অনুষ্ঠানে সন্তানকে দেওয়া হাদিয়া সেই সন্তানেরই প্রাপ্য এবং হক্ব। সন্তান নাবালেগ বা অবুঝ হলে সন্তানকে সেই জিনিস ব্যবহার করতে দিতে হবে। আর যদি জমানো কোনো জিনিস হয় যেমন অর্থ বা সোনা

রূপা তবে সেগুলো পিতা মাতা সন্তানের বড় হওয়া পর্যন্ত নিজেদের কাছে আমানত স্বরূপ গচ্ছিত রাখবে। প্রয়োজনে পিতামাতারা খরচও করতে পারে তবে সন্তান বুঝমান হওয়ার পর তাদের সেই হাদিয়া বা তোহফা বুঝিয়ে দিতে হবে। এরপর যদি সন্তানের ইচ্ছে হয় তবে সে তার পিতা মাতাকে তা দিয়ে দিতে পারে। আর বাচ্চা বুঝমান হলে আগেই তার থেকে অনুমতি নিয়ে তার প্রাপ্ত জিনিস পিতা মাতা ব্যবহার করতে পারে বা তাদের কাজে লাগাতে পারে এতে কোনো দোষ নেই। আর যদি এমন কোনো জিনিস হয় যেমন পোশাক আসাক বা খাবার জিনিস তবে তা একদিন হলেও বাচ্চাকে পরিধান করিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিবে। পরবর্তীতে সন্তানকে এ বিষয়ে অবগত করবে।

আমাদের দ্বীন সর্বদাই আমাদের ন্যায় ও ইনসাফ শিক্ষা দেয়, তাই ছোটখাটো বিষয়ও আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে করবো ইনশাআল্লাহ।

অবাধ্য সন্তান

সন্তান অবাধ্য বা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়লে বাবা-মা হিসেবে অত্যন্ত ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং ইসলামিক নির্দেশনা মেনে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা উচিত। ইসলামে সন্তানকে আল্লাহর দেয়া আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তাই রাগের মাথায় কোনো ভুল পদক্ষেপ না নিয়ে কৌশলগত ও ধর্মীয় উপায় অবলম্বন করা জরুরি।

ইসলামের আলোকে অবাধ্য সন্তানকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য করণীয় বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. নিজের আচরণ সংশোধন ও আত্মউপলব্ধি

সন্তানের সংশোধনের আগে বাবা-মাকে নিজেদের আমল ও আচরণের দিকে নজর দিতে হবে।

উপার্জন হালাল রাখা: সন্তানের স্বভাব-চরিত্রের ওপর বাবা-মার হালাল উপার্জনের বিশাল প্রভাব রয়েছে। তাই ঘরে যেন হারাম উপার্জনের কোনো অংশ না আসে, সেদিকে কঠোর নজর দিন।

নিজেদের আচরণ ঠিক করা: সন্তানরা সাধারণত বাবা-মাকে দেখেই শেখে। পারিবারিক পরিবেশ শান্ত রাখা এবং নিজেদের ইবাদত-বন্দেগিতে নিয়মিত হওয়া জরুরি।

২. রাগের মাথায় অভিশাপ বা বদদোয়া না দেওয়া

সন্তান চরম অবাধ্যতা করলেও কখনোই রাগের মাথায় তাকে গালিগালাজ বা বদদোয়া (অভিশাপ) দেওয়া যাবে না।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"তোমরা নিজেদের ওপর, তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং তোমাদের ধন-সম্পদের ওপর বদদোয়া করো না। কারণ এমন একটা মুহূর্ত থাকে যখন কোনো দোয়া করা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন।"* (সহীহ মুসলিম)

রাগের মাথায় দেওয়া বাবা-মার অভিশাপ সন্তানের জীবনকে আরও বেশি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

৩. ধৈর্য ধারণ ও নম্র ব্যবহার

মারধর বা অতিরিক্ত শাসন অনেক সময় সন্তানকে আরও বেশি জেদি ও অবাধ্য করে তোলে।

তার সাথে বন্ধুর মতো মিশুন এবং তার অবাধ্যতার পেছনের মূল কারণ (যেমন: খারাপ সঙ্গ, মানসিক দূরত্ব বা কোনো হতাশা) বোঝার চেষ্টা করুন।

মহান আল্লাহ বলেন: *"যদি তুমি কঠোরচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত।"* (সূরা আল-ইমরান: ১৫৯)। তাই স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন।

৪. আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা

হৃদয় পরিবর্তন করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। নবী-রাসুলগণও তাঁদের সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া করেছেন।

কুরআনি দোয়া: প্রতিদিন নামাজের পর এই দোয়াটি পড়ার অভ্যাস করুন:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ: "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের জন্যে অগ্রগামী করো।" (সূরা আল-ফুরকান: ৭৪)

সূরা আল-আহকাফের দোয়া: এই দোয়াটিও করা যায়:

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: "এবং আমার সন্তানদের সংশোধন করো, নিশ্চয়ই আমি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আল-আহকাফ: ১৫)

৫. দ্বীনি পরিবেশ তৈরি ও সৎ সঙ্গের ব্যবস্থা

সন্তানকে দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করুন। তাকে ভালো কোনো আলেম বা পরহেজগার মানুষের সান্নিধ্যে নিয়ে যান, যা তার চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনতে পারে।

সে কাদের সাথে মেলামেশা করছে, সেদিকে খেয়াল রাখুন এবং তাকে সৎ ও ভালো বন্ধু বেছে নিতে সাহায্য করুন।

একটি ঘটনাঃ এক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিকে এসে এক লোক বলল, হযরত! অমুক ব্যক্তি আপনার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু এমন সময় তার ছেলে কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়। ফলে এই দুশ্চিন্তার কারণে তার আর এদিকে আসা হয়নি। আল্লাহওয়ালা ব্যাক্তিটি বললেন, ওই ছেলে যদি প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হয়, তবে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া উচিত। এই ধরনের অযোগ্য ও নালায়েক ছেলেদের অবস্থা অতিরিক্ত আঙুলের মতো—অর্থাৎ, ওটা রাখাও অস্বস্তিকর, আবার কেটে ফেলাও কষ্টকর।

আমি একজন আলেমের অবস্থা দেখেছি। তিনি একাধারে একজন আলেম এবং ডেপুটি কালেক্টরও ছিলেন। পেনশন পাওয়ার পর তিনি ভেবেছিলেন, এবার নীরবে আল্লাহ আল্লাহ করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা, তিনি জিকির-আজকার শুরু করার পরেই একসঙ্গে তার দুটি ছেলে পাগল হয়ে গেল। তারপর তিনি তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে এমন দুশ্চিন্তায় জড়িয়ে পড়লেন যে, পরবর্তীতে আর নিয়মিত জিকির-আজকারে সময় দেওয়ার সুযোগ করতে পারলেন না।

কিন্তু আল্লাহর আরিফগণ (আধ্যাত্মিক জ্ঞানী ব্যক্তিরা) কখনো কোনো বিষয়ে বিচলিত হন না এবং নিজের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট অবস্থা নির্ধারণ করে নেন না। আল্লাহ পাক যখন যে হালতে রাখেন, সেই হালতেই সন্তুষ্ট থাকেন। আল্লাহ যখন সুযোগ দেন তখন নীরবে জিকির-আজকারে সময় কাটান, আর যখন তার সুযোগ থাকে না।

তখন যে পরিস্থিতিতে রাখেন, সেই পরিস্থিতিতেই রাজি থাকেন।

আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। আল্লাহর এই সন্তুষ্টি অনেক সময় নীরব-নির্জনতায় লাভ হয়, আবার অনেক সময় সৃষ্টিজীবের সেবার মাধ্যমেও লাভ হয়। সুতরাং পাগল সন্তানদের সেবার মাধ্যমে কি তিনি সওয়াব লাভ করবেন না? অবশ্যই লাভ করবেন। বরং এই পরিস্থিতিতে চিন্তা ও পেরেশানির মাধ্যমেই তাঁর উন্নতি লাভ হবে। এই সময় চিন্তাহীন ও নিশ্চিন্ত থাকা তাঁর জন্য কল্যাণকর নয়। বরং এই সময় নীরবে বসে আল্লাহর জিকির করার তুলনায় অসুস্থ সন্তানদের সেবা করলেই বেশি সওয়াব লাভ হবে। সুতরাং বান্দার পক্ষে কোনো পরিস্থিতিতেই পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই।

ইয়াতিমের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামে ‘এতিম’ বলতে মূলত সেই সন্তানকে বোঝায়, যার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। পিতা না থাকার কারণে এই সন্তানদের সঠিক লালন-পালন, মানসিক নিরাপত্তা প্রদান এবং তাদের সম্পদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেঁচে থাকা মাতা অথবা অভিভাবকের দায়িত্ব অন্যদের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে যায়।

এতিম সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মাতার প্রধান দায়িত্বগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. স্নেহ ও মানসিক নিরাপত্তা প্রদান

এতিম সন্তান যেন পিতৃস্নেহের অভাব বা হীনম্মন্যতায় না ভোগে, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সাথে রুক্ষ আচরণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন,

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

"অতএব, আপনি এতিমদের প্রতি কঠোর হবেন না" (সূরা আদ-দুহা, আয়াত ৯)।

২. সম্পদের পরিপূর্ণ সুরক্ষা ও বৃদ্ধি

সন্তানের যদি কোনো পৈতৃক সম্পত্তি থাকে, তবে পিতা বা অভিভাবকের দায়িত্ব হলো তা অত্যন্ত সততার সাথে সংরক্ষণ করা।

কোনোভাবেই এতিম সন্তানের সম্পদ অন্যায়ভাবে বা নিজের প্রয়োজনে খরচ করা যাবে না।

বরং তাদের সম্পদ ব্যবসায় খাটানো যেতে পারে, যাতে তারা সাবালক হলে তা বৃদ্ধি পায়।

৩. সুশিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠন

অন্যান্য সাধারণ সন্তানের মতো এতিম সন্তানেরও দ্বীনি ও পার্থিব শিক্ষা নিশ্চিত করা পিতা-মাতার প্রধান কর্তব্য। তাদের সৎ, আদর্শবান ও আল্লাহভীরু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরো বেশি তৎপর হতে হবে।

৪. সঠিক সময়ে সম্পদ হস্তান্তর

সন্তান যখন দৈহিক ও মানসিকভাবে সাবালক বা বিবাহযোগ্য হবে এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারবে, তখন তার প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"আর তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখো (পরীক্ষা করো), যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছায়। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান (পরিপক্কতা) দেখতে পাও, তবে তাদের সম্পদ তাদের কাছে সমর্পণ করো। তারা বড় হয়ে যাবে বলে তোমরা অপচয় করে এবং তাড়াহুড়ো করে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। আর যে অভাবমুক্ত, সে যেন (ইয়াতীমের সম্পদ থেকে) বিরত থাকে এবং যে বিত্তহীন, সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। অতঃপর তোমরা যখন তাদের সম্পদ তাদের কাছে সমর্পণ করবে, তখন তাদের ওপর সাক্ষী রেখো। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"(সূরা আন-নিসা, আয়াত ৬)।

৫. ভরণপোষণ ও শারীরিক যত্ন

বাবার অবর্তমানে মা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক সন্তানের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে সচেষ্ট থাকবেন।

এতিম সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন এবং তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা দুনিয়া ও আখেরাতে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। হাদিস শরীফে এতিমের অভিভাবককে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে জান্নাতে একসাথে থাকার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং পারিবারিক জীবনকে মানবসমাজের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। পরিবার কেবল রক্তের সম্পর্কের সমষ্টি নয়; বরং এটি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, ত্যাগ, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। ইসলামে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ককে অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কের সুস্থতা ও সৌন্দর্য নির্ভর করে উভয় পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের ওপর। তাই ইসলাম একদিকে যেমন পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার নির্ধারণ করেছে, অন্যদিকে সন্তানের ওপরও পিতা-মাতার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমাদের সমাজে পিতা মাতার উপর ন্যায় ও ইনসাফ করা একটা জনপ্রিয় টার্ম অপরদিকে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার ইনসাফ এ নিয়ে বেশ কম কথা-ই হয়। অথচ দুটো সমান তালেই হওয়া উচিত। কিছু কিছু পিতা মাতা সন্তান জন্মদানের পর মনে করেন সন্তান তাদের অধিন্যস্ত তাই যা ইচ্ছে তাই করা যাবে কিন্তু ইসলাম তা কখনোই সমর্থন করেনা। পরিবারে শান্তি শৃঙ্খলভাবে বেঁচে থাকতে হলে উভয়ের প্রতি উভয়ের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উভয়ের প্রতি মুহাব্বত তৈরি করতে হবে।

এই গবেষণায় আলোচিত হয়েছে যে, সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পিতা-মাতার জন্য এক মহামূল্যবান আমানত। এই আমানতের যথাযথ পরিচর্যা করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সন্তানের জন্মের পর থেকে তার শিক্ষা, লালন-পালন, নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশ, দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা, শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিতকরণ এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর অর্পিত হয়েছে। একজন সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন, তার চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ এবং চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। যদি পিতা-মাতা ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী সন্তানকে গড়ে তোলেন, তবে সেই সন্তান পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর সম্পদে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে দায়িত্ব পালনে অবহেলা সন্তানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

একইভাবে সন্তানের ওপরও পিতা-মাতার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে তাওহীদের পরেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাদের সম্মান করা, আনুগত্য করা, সেবা করা, প্রয়োজন পূরণ করা, কোমল ভাষায় কথা বলা, তাদের কষ্ট না দেওয়া, বার্ধক্যে তাদের পাশে থাকা এবং মৃত্যুর পরও তাদের জন্য দোয়া ও সাদাকায়ে জারিয়ার ব্যবস্থা করা সন্তানের মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। পিতা-মাতা সন্তানের জন্য যে ত্যাগ, কষ্ট ও আত্মনিবেদন করেন, তার প্রতিদান প্রকৃতপক্ষে পূর্ণরূপে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ইসলাম সন্তানকে সবসময় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ, বিনয়ী ও দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়।

বর্তমান বিশ্বে পারিবারিক বন্ধন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। আধুনিকতা, ভোগবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতা সন্তানের সঠিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন, আবার অনেক সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করছে। এর ফলে পরিবারে অশান্তি, সামাজিক অস্থিরতা এবং নৈতিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামের পারিবারিক শিক্ষাগুলো পুনরুজ্জীবিত করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যদি পরিবার পরিচালিত হয়, তবে পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ গবেষণার আলোচনায় আরও প্রতীয়মান হয়েছে যে, পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কেবল একটি আদর্শ পরিবারই গড়ে ওঠে না; বরং একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়। কারণ পরিবারই সমাজের প্রথম শিক্ষালয় এবং পিতা-মাতা ও সন্তানই তার প্রধান উপাদান। পরিবারে যদি ইসলামী মূল্যবোধ চর্চা হয়, তবে সমাজেও তার ইতিবাচক প্রতিফলন দেখা যায়। একজন দায়িত্বশীল পিতা-মাতা যেমন আদর্শ সন্তান গড়ে তোলেন, তেমনি একজন কর্তব্যপরায়ণ সন্তান পিতা-মাতার মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।